দৃষ্টিভঙ্গি

শারদীয়া পত্রিকা ১৪২৭

দৃষ্টিভঙ্গি

শারদীয়া পত্রিকা ১৪২৭

সূচিপত্র

কবিতা পৃষ্ঠা ১-১৪

- গোলাম রসুল
- অভীক বসু
- রাজিবকান্তি রায়
- সৌরভ চন্দ
- পিনাকী রায়
- গৌরব চক্রবর্তী
- নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়
- সুদীপ্তা
- শ্রীরূপা রায়ঠাকুর
- ডালিয়া বসু সাহা
- রণজিৎ কুণ্ড
- তন্বী দাস
- আনন্দ মুখোপাধ্যায়
- দেবপ্রিয় হোড়
- অরিত্র চট্টোপাধ্যায়
- তুষার ভট্টাচার্য
- সুখেন্দু রায়
- রূপ বন্দ্যোপাধ্যায়
- মানস মোদক
- অরূপরতন চক্রবর্তী
- অগ্নিভ নিয়োগী

প্রবন্ধ পৃষ্ঠা ১৫-১৭

- নির্মাল্য ঘোষ
- ঋতম প্রামাণিক

আলোকচিত্র পৃষ্ঠা ১৮

- রবিউল ইসলাম

গল্প পৃষ্ঠা ১৯-৪৪

- প্রচেত গুপ্ত
- মধুরিমা রায়
- দেব কুমার দাস
- শাওন বাগচী
- শুভম গাঙ্গুলী
- সোমা দে
- অনুশ্রী ঘোষাল
- সন্টু অধিকারী
- সঞ্চারী চক্রবর্তী চ্যাটার্জ্জী

সাক্ষাৎকার পৃষ্ঠা ৪৫-৪৯

- মনোরঞ্জন ব্যাপারি

পেটপুজো পৃষ্ঠা ৫০-৫১

- শতাব্দী ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ: প্রতীম বসাক সম্পাদক: অগ্নিভ নিয়োগী

ভয়

গোলাম রসুল

পৃথিবীর বয়স বাড়ছে
আর সে বেশি করে আমাদের কাছে আশ্রয় চাইছে

তখন ছিল বেহিসেবি মধ্যযুগ
মাঝ রাস্তায় একটা গরুর গাড়ি হারিয়ে গেলো
সমুদ্রের ওপর গাছ
কৃষ্টিবাণ বাঁদরের কিচির মিচির
বিক্ষিপ্ত ছায়া
নষ্ট হচ্ছে আলো

মানুষের আত্মার প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে বহু বছরের পুরোনো শরীর
যে ভাবে আমরা শহরের প্রকল্পে ঢুকি
বেরিয়ে আসি

প্রেমের বিশ্রী গন্ধ
আবর্জনার ওপর পরিষ্কার হওয়া
আমরা কালো পোশাক পরে নিই

এখন আকাশে গভীর রাত্রি
জলের ধারে ভয়
ম্যানহোলের ঢাকনা খোলা
মেঘের সামনে সৈন্যদল
বিমূর্ত অন্ধকারের রাগি চিৎকার
শ্রমিকদের হাড় ভাঙার গান শোনা যাচ্ছে মরুভূমির দিক থেকে

সবচেয়ে প্রাচীন ভোর
আমরা বারবার কাঁধ ঝাঁকালাম আর সূর্য উঠলো
আমি কাঁদছিলাম আমার বৃদ্ধ পিতার জন্য
তারপর ভিড়ের মধ্যে আমার জ্বর এলো
আর আমার হাতের নদীগুলো থেমে দাঁড়ালো শুণ্যের মুখে

জঙ্গলে গানমেলা

অভীক বসু

বললে কোকিল, “পাখির রাজ্যে গানের বড়ই আকাল,
রং-বেরং এর সুন্দরী সব গুণের বেলায় মাকাল,
কোকিলকণ্ঠী লতা কিন্তু আমায় কে আর পোঁছে
বসন্তকাল পড়লে মাত্র দূমাস দুঃখ ঘোচে
তাইতো বলি গাইতে পারেন যেসব বনের পাখি
গান মেলাটা বসাই বনে, সাড়া দেবেন না কি?”
তোতা বললে আজ্ঞে হাজির, ময়না দিল সায়
বসল সেদিন গানের আসর কুর্চি বনের ঝোপে
পাখিরা সব গাইতে এল প্রাণ মন সব সঁপে
জীবনমুখী গাইলো কেউ টপ্পা পুরাতনী
সুরের খেয়ায় ভাসল সবাই মাতল গহন বনই,
কাক ছিল না সেই তালিকায় কারণ সে বেসুরো
কেউ বুঝি ওর নাম করাতে বললে কোকিল দুর হে
কাঠঠোকরা অমনি উড়ে কাককে দিল খবর
কাক কোকিলের সম্পর্কে চিড় ধরল জবর
কাকের বাসায় ডিম পেড়ে যায় কোকিল এসে উড়ে
গান মেলাতে কাককে তারা রাখল এতো দূরে
কাকগুলো সব খেপলো এবার যেন উগ্রপন্থী
কোকিলকুলের সঙ্গে তাদের আর কোন নয় সন্ধি
দাঁড়কাকটি দলের নেতা একটুও নয় ভণ্ড
বুদ্ধি দিল গমেলাকে করতে হবে পণ্ড
কাকগুলো সব বসল গিয়ে কুর্চি বনের ধারে
চুপি চুপি ঝোলায় মাইক ইলেক্ট্রিকের তারে
তারপরেতে তারস্বরে চেঁচায় খালি কা-কা
কোথায় গেল পাখিরা সব গানমেলা যে ফাকা
পাখিরা সব পালিয়ে গেছে কারণ তাদের প্রাণদায়
কোকিল গেছে কলকাতাতে ক্যাসেট করার ধান্দায়

এই মহমারীতে বাঁচলে পরে

রাজিবকান্তি রায়

এই মহামারীতে বাঁচলে পরে কথা দিলাম মানুষ হব
সত্যিকারের মানুষ হব
এ যাত্রায় বেঁচে গেলে উজার করে ভালোবাসবো
ফুল পাখিদের বন্ধু হব
গাছ গাছালির সঙ্গী হব
বাউল উড়নচন্ডি হব
মনের মাঝের খুশিটাকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবো
পৃথিবীটাকে সাজিয়ে দেবো
সবুজ প্রাণে ভরিয়ে দেবো
কথা দিলাম এইবারেতে জীবাণুদের হারিয়ে দিলে
পরমাণু ত্রাস নিভিয়ে দেবো এবার আমরা সবাই মিলে
বাঁচলে পরে
এবার সত্যি মানুষ হব
সত্যি সমব্যথী হব
এইবারেতে বেঁচে গেলে ধর্ম ছাড়া মানুষ চিনব
যুক্তিবাদের আগুন জ্বেলে অন্ধকারে পথ দেখাব
জাতপাতেরই ফারাক মুছে মানুষ হয়ে হাত বাড়াব
এ যাত্রায় বাঁচলে পরে তবে
একটি বার ফিরে যেতে চাই ফেলে আসা শৈশবে
রূপকথা আর ছড়ার গানে
ঝালমুড়ি আর ঘুড়ির টানে
হিসেব বিহীন বন্ধুরা সব এবার আবার আড্ডা দেবো
পুরোনো সেই ডাইরী খুলে তোরই প্রেমে গান লিখব

এইবারেতে বাঁচলে তোকে নতুন করে ভালবাসবো
তোর সাথে ফের ফুচকা খাবো
গড়ের মাঠের সন্ধ্যেবেলা তুই আমি আর আকাশ নীল
তোর প্রেমেতে নতুন করে তুইই তো আমার অন্তমিল
এইবারেতে বাঁচলে পরে নারী তোমার মান রাখব
ধর্ষণ পাপ ঘুচিয়ে দেবো
মায়ের চোখের জল মোছাব
মাগো তোমার আঁচল হব
এই যাত্রায় বেঁচে গেলে প্রকৃতিকে দেখতে হবে
ভীষণ দূষণ রুখতে হবে
নদী সাগর জল বাঁচানো
অকারণে তেল পোড়ানো
সবকিছু ঠিক করতে হবে
নতুন করে বাঁচতে হবে
এ মহামারীতে বাঁচলে পরে দুনিয়টাকেও বাঁচাতে হবে
এ যাত্রায় বাঁচলে পরে ভীষণ ভালো বাসতে হবে

সে এক অন্য দিনের কথা

সৌরভ চন্দ্র

সে এক অন্য দিনের কথা, খুব ঝড়, শেষ হয়ে গেল অনুষ্ঠান
পাখিদের বিশ্রাম উড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়া
ভয় পেয়ে গেলাম, আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেলাম।

সহসা সাদা কাপড় ও জীবনের স্পন্দন দেখা গেল দূর থেকে
সবকিছু উড়ছে হাওয়ায়
উড়ছে জীবন, সঙ্গীত, অতীত ছবি

তুমি আমার পাশে স্থির
চূড়ান্ত শক্ত করে ধরে আছো গোপন হাত
সন্দেহের মতো কিছুই ছিল না তোমার দীর্ঘশ্বাসে
সংশয়, হাহাকার, সন্ধ্যার বিবস্ত্র শরীর
উড়ে উড়ে চলে গেল অনেকদূর
চূড়ান্ত শক্ত করে তুমি ধরে আছো আমার গোপন হাত।

তারপর আর কিছু নেই
এক, দুই, তিন গুনতে গুনতে অসম্ভব শান্ত নামবে নবজন্ম হয়ে
বোবা হাওয়ায় হারিয়ে যাবে ভয় পাওয়া চিঠি
সন্ধ্যা ঝুপ করে নামিয়ে দেবে রাতের প্রলেপ
এক, দুই, তিন করে নিশ্চিন্ত নৌকোরা নেমে যাবে মৃত্যুর গাঢ় সীমানায়।

রাধাচূড়া গাছ আজ বড়ো নড়বড়ে
চূড়ান্ত ভুল করে তার ডালে বেঁধে যাওয়া সুতো উড়ে গেছে সেই কবে!

ধিক তুমি ধিক

পিনাকী রায়

শাহিনবাগের মেয়ে আমার
কলকাতারও মেয়ে
ফুল ছড়াচ্ছ, ফুল ছড়াচ্ছ
কন্যা থেকে হিমালয়।

তোমার সঙ্গে হাঁটছে ভারত
তোমার সঙ্গে ধর্না
রাষ্ট্র যতই চাইছে হত্যা
আমরা বাঁধছি হিয়ার মধ্যে হিয়া

ত্রিশুল কে তুমি করেছ খাদক
গেরুয়াতে রক্ত ছিট
দীর্ঘ বাঁধন চিতাকাঠে ঢাকো
বলতেও লজ্জা, ধিক তুমি ধিক।

গঙ্গা থেকেই হোকনা শুরু
বাতাসে ডম্বরু
দাগের তত্ত্ব, রেখার তত্ত্ব
অতল খাদে মিলিয়ে যাবে
প্রান্তরে মৃত রুরু।

শারদ

গৌরব চক্রবর্তী

তোমার সামান্যের পাশে আমি আমার সমগ্র রেখে দিলাম
তোমার স্তব্ধতার পাশে রেখে দিলাম সমস্ত কোলাহল
তোমার মৌনতা নিয়ে আমার অন্তরটুকু জাগিয়ে রেখেছি
হাত দিয়ে সরিয়ে রেখেছি তীব্র কিছু ঝড়ের বানান

আমার সমূহ শোক ও শাসনগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল মেঘের ধাক্কায়
যেকোনো মুগ্ধতায় ভেতরটা যখন আলো হয়ে আসে-
আমি টের পাই, এক মায়াবৃক্ষের ছায়ায় চোখ বুজে
জিরিয়ে নিচ্ছে ক্লান্ত কোনও পথিক
আমি সেই ছায়ার অনুবাদ করে, সেই মায়ার অনুবাদ করে
তোমার - আমার নিয়তির সামনে মেলে রেখেছি- টানটান
দূর থেকে মনে হয়, কাশবনে বিগত শরতের গন্ধ লেগে আছে

সত্যিই স্বর্গীয়

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

আজকাল বয়স বুঝতে পারি বেশ।
হাঁপিয়ে উঠি।
বাবু ঘর থেকে যখন - তখন চলে যায়।
কেন যায়,জানি না কোথায় চলে যায়।
রাত করে ফেরে। কথা নেই খাওয়া নেই।
নেশা ওর ঘুমের চাদর দিই গায়ে, চাঁদ দেখি-

ভুল পথে বাবু
রাংতা ধোঁয়ায় নখওলা বিড়াল
মাটি আঁচড়ে বমি ফেলতে - ফেলতে কাঁদছে

যে কান্না যামিনীর মায়া
যে সহজ সারল্য সার্থক
পৃথিবীর সকল সন্তান সেইখানে অপরাধহীন,

বাঁচা অপূর্ব, আর তাদের তখন
সত্যিই স্বর্গীয় বলে মনে হয় আমার।

নতুন খেলা

সুদীপ্তা

আসুন নতুন খেলায় মাতি
যেখানে না আপনি খুঁজবেন ভাগশেষের নতুন থিয়োরি,
না আমি তাকাবো আপনার অক্ষরদের প্রতি চেনা আকুতি মেখে...

সব রহস্য কি ট্রাম লাইন সঞ্জাত সুগন্ধীর করয়াত্ত?
থাকুক সেই কশমাকশটা...

আপনিও কি আর অলংকারদের চিনবেন সংখ্যাতত্ত্বের ভিড়ে?

আগুনরঙা দৃষ্টি পেরিয়ে বৃষ্টিবাহার আহত মেঘেদের,

এখন অচেনা হওয়াই দস্তুর।।

অনভ্যস্ত

শ্রীরূপা রায়ঠাকুর

কি করে বোঝাই মনকে এ রকমই হয় আজকাল
সবাই অভ্যস্ত এতে
শুধু আমি ই ধাক্কা খাই বন্ধ কপাটে
এখনো তা খোলা মনে করে
এমনই তালকানা আমি...

ছোট বসতেও এককোণে গোটানো থাকে
শীতলপাটি
মায়ের খোঁপার মতো তা খোলে
একঢাল বিস্তৃত মাটি
জবাকুসুম তেলের সেই চেনা গন্ধ পায় ক্লান্ত জনে
এক অপার শান্তিতে...

এই বিস্তার আমি কোথায় পাবো?
সাজানো বসার সোফা তো অনেক ঘরে
স্বার্থকীটের সুতো দিয়ে তৈরী ঝলমলে
কিন্তু পিছলে যায় বারে বারে...

যেন মনে করায় অনাহুত তুমি, আহ্বানহীন
কপাট বন্ধ হয় প্রতিদিন
অনেকেই আজ অভ্যস্ত এতে
শুধু আমি ই ধাক্কা খাই বন্ধ কপাটে।।

সতীদাহ

ডালিয়া বসু সাহা

তুমি এসেছিলে তারা খসার গতিতে,
উজ্জ্বল চারপাশকে দেখাতে পারি নি দহন
স্বপ্নের আলুথালু মৃত্যু।

প্রেমের ছদ্মবেশী সুগন্ধে
আত্মার পোড়াগন্ধও চাপা পড়ে কখনও,,
তবুও প্রেম-স্বপ্নের অন্তর্লীন হাড়ুডু-র
ফল ঘোষণা হয়নি তখনও।

প্রেমিক ময়াল ক্রমশ গ্রাস করছে আমিত্ব---
পাকে পাকে মরুভূমির পূর্ণিমা,
পরীর জ্যোৎস্না-ভ্রমণ।
ঘুম ভাঙলেই নেশাগ্রস্ত পা খোঁজে মাটি---
আর তখনই
পুরুষ-প্রেমের বংশগত নাম হয় অধিকার।
হাড়ুডু-র ফল ঘোষণার পর ভাবনাগুলো কাঁধে হাত রাখে;

প্রেমের পোড়া গন্ধ থাকে,
পাথুরে-বাস্তবের সম্বল স্বপ্নের ফলগুধারা।
আবার আবার আবার চিতা থেকে উঠে আসে
ঘুমভাঙা সতী।

জ্যোৎস্না

ডা. রণজিৎ কুন্ডু (বিজিগীষা)

ললনার লালি আর চাঁদের বাঁধভাঙা হাসি
দুটোই ডেকে আনে-
কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ।

সদ্য যৌবনার মতো জ্যোৎস্না তার কারনসুধায়,
নিমেষে বিহ্বল করে তোলে গোটা পরিবেশকে।
চন্দ্রমলিকা-রজনীগন্ধা-হাস্নাহেনার আহাদী আহ্বান-
নেশার মাত্রা বাড়ায় কয়েকগুন।
আকাশের বুকচিরে সোম-নক্ষত্রের ঝলকানি,
সাথে কূলকূল করে বয়ে চলা প্রবাহিনী;
মূহুর্তে সন্মোহিত করছে জগৎ সংসারকে।
ঘুমপাড়ানি গানে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর পিঠে চড়ে
ক্ষুধাগ্নি থেকে বহু ক্রোশ দূরে বংশপ্রদীপ।
রাতের জীবেরা বেরিয়েছে নিজেদের জ্বালা মেটাতে।

এই কৌমুদীতে, কেউ জেগে রয়েছে
প্রিয়জনের বুকে।
কেউবা নিদ্রাহীন নিশিকে আলিঙ্গন করে,
ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক
আর টুপটুপ করে খসে পড়া
জীর্নপত্রের মর্মরধ্বনিতে।

করিমচাচার উমা

তন্বী দাস

এবার শরৎ বড়োই ফিকে ,
পুজোর হুজুগ নেই।
উমার আসার খবর পেলাম এই একটু আগেই,
পদ্মদিঘীর মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেম একা।
ও গাঁয়ের বেনেবৌ, আলের ধারে দেখা।
হাঁক দিলে," উমার সঙ্গে হলো নাকি দেখা!"
কোথায় উমা! সকাল থেকে খুঁজেই গেলুম সার।
একটি বারও পেলুম না তো চোখের দেখা তার।
আছে কেমন, বছর ঘুরে দেখতে কেমন হলো!
প্রশ্ন হাজার, উমা আমার হারিয়ে কোথায় গেলো!

বটতলার করিমচাচা ছুটছে সরাণ ধরে।
মেয়ে এসেছে চাচার ঘরে লকডাউনের পরে।
বললে হেঁকে,"মেয়ে এয়েচে, নাতিনাতিন নিয়ে"
পিছু নিলাম করিমচাচার, দেখি একবার গিয়ে।
এবার ঈদে হয়নি দেখা, চাচা বেজায় খুশী।
লকডাউনে ঈদও ফিকে,হয়নি ব্যাপার বেশি।
চাচার ঘরে ঢুকেই দেখি দাঁড়িয়ে আছে উমা,
চাচা দুহাত বাড়িয়ে বলে,বুকে আয় মা আমিনা...
একটি বছর পরে আজ আমিনা এলো ঘরে,
হাজার বাতির আলো এখোন চাচার ভাঙা ঘরে।

ফেরা

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

একটা পৃথিবী ছিলো
যাতে আমি ছিলাম, তুই ছিলি আর ছিলো
বেঁচে থাকার তীব্র ইচ্ছা।
যে পৃথিবী জুড়ে ছিলো নবান্নের ঘ্রান,
বীরেন্দ্র কৃষ্ণের ভোর, আর হাতে হাত রেখে
হেঁটে চলার শপথ। আজ সেই পথে
লাশের স্তুপ দেখি, নিরন্ন মানুষ দুয়ারে ফেরে,
ফেরি করে নিজের স্বপ। ভাঙা ছাদের নিচে
অভাবী সংসার!!
একটা পৃথিবী ছিলো
তার নক্ষত্র ভরা আকাশের নিচে
মানুষের ঘরে ফেরার বাসনা ছিলো, আর ছিলো
ফুটন্ত ভাতের সুঘ্রাণ।
যে পৃথিবী জুড়ে ছিলো বইপাড়ার
ব্যস্ততা, মুখো মুখি কফি হাউসের প্রেম আর
তোর আমার নিরন্তর সামাজিক হওয়ার প্রয়াস।
আজ সেই আকাশের নিচে সন্তান হারা মায়ের কান্না, সন্তান পরিত্যক্ত মায়ের চোখের জল,
শেষ আলো টুকু ও নিভে যায় দিনের !!
একটা পৃথিবী ছিলো
যাতে তুই ছিলি,আমি ছিলাম আর ছিলো ফেরার অদম্য ইচ্ছা।

অনবদ্য কর্ম

দেবপ্রিয় হোড়

এতকাল যে মানুষ নীরব দর্শক থেকেছে,
নির্বিচারে, নির্বিকারে প্রকৃতি নিধন খেলার;
আজ সে মানুষই সাক্ষী রয়েছে,
প্রকৃতির মনুষ্য নিধন পালার।
এইতো সেদিন আমাজন জ্বলছিল বিষবাষ্পে,
আর আজ সমস্ত মেদিনী মোড়া মাস্কে।
মানুষের এখন কঠিন, কঠিনতর অসুখ,
নেই প্রাণের নিশ্চয়তা, নেই মনের সুখ।
নিস্তার পেতে মরিয়া আজ সর্বশক্তিধর-কাঙাল,
স্তব্ধ পৃথিবী হাতড়ে ফেরে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল।
ব্যাধি চেনেনা বর্ণ, জানেনা জাতি-ধর্ম,
মুক্তির পথে লেখা আছে 'অনবদ্য কর্ম'।

ব্যাঙ্গালোরের আকাশে কোন তারা নেই

অরিত্র চট্টোপাধ্যায়

ব্যাঙ্গালোরের আকাশে এখন কোন তারা নেই
তারাদের শুন্যতাও এক অদ্ভুত মহাজাগতিক অন্ধকারের মত
আর আমরা যারা চন্দ্রাহত, তারা ঠিক এইসব টের পাই
আর মিনারের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে থাকি... দেখব বলে
ব্যাঙ্গালোরের আকাশ থেকে শেষ কটি তারা খসে পড়ল কিনা
অনেকটা ওপর থেকে আসলে অধিকাংশ মানুষ-ই এক
নিঃসঙ্গ, শিকড়বিহীন আর কিছুটা বেশিরকম আমোদপ্রিয়
অনেকটা ওপর থেকে দেখলে সব মানুষের ভালবাসার প্রয়োজন
আর আমরা যারা চন্দ্রাহত, তারা ঠিক এইসব জানতে পারি
দেখতে পাই শহরের মাটি অজস্র মৃত তারার টুকরো তে ঢাকা
সেইসব মৃত তারাদের পড়ন্ত আলোয় উলাসরত সব দুঃখী মানুষ
আর আমরা যারা চন্দ্রাহত, একলা মিনারের ওপর থেকে দেখতে পাই
এই শহরের আকাশ থেকে শেষ তারাটি ও ক্রমে খসে পড়ল
নিচে দানা বাঁধে মৃত তারাদের গুঁড়ো, নিভন্ত আলো আর ক্রমবর্ধমান অন্ধকার

শূন্যতার অশ্রু বাগানে

তুষার ভট্টাচার্য

শূন্যতার অশ্রুবাগানে যে অচিন পাখিটি
শীতের ঝরা পালক ফেলে চলে গেছে অনাদরে ,
শুকনো হলুদ পাতার মর্মর কান্না ধ্বনির ভিতরে
আমি তাঁকে খুঁজি নিরন্তর;

বিজন দুপুরে লাহিড়ি পুকুরের খিড়কি ঘাটে বসে
যে বধূটি ফরসা টলটলে জলের ভিতরে নীরবে
ফেলে চলে গেছে বিদীর্ণ দুঃখে,
দু'চোখের জল তাঁকে আমি খুঁজি মেঘের তুলিতে আঁকা
আকাশ দিগন্ত বরাবর ;

এই পৃথিবীর সমস্ত দুঃখী শোকার্তের কাছ থেকে আমি
দু'হাতের মুঠোয় বিন্দু বিন্দু অশ্রু কুড়িয়ে আনি ,
তারপর শ্মশান বালকের মত সবার অশ্রুমতি জল
নিজের হাতে পুড়িয়ে দিই জ্বলন্ত চিতার আগুনে

আঁচড়

সুখেন্দু রায়

অনেক ছন্দ খেলেছিলো মাথায়।
ভেবেছিলাম একটা আস্ত বই লিখবো কবিতার।
ভাষার বিন্যাস ও সাজিয়ে ফেলেছিলাম।

তারপর,
লিখেও ফেলেছিলাম দু চার কলম। কিন্তু
তোমার ল্যাকরিমাল গ্রন্থীর বাড়াবাড়ি দেখে
থেমে গেলো আমার লেখনি।
সাদা কাগজটা পড়ে রইলো আঁচড় বিহীন হয়ে।
হ্যাঁ কলমের আঁচড়।

লেখা ছেড়ে খুঁজতে বেড়োলাম "কারণ" কে।
খুঁজে পেয়েছিলাম জানো? ভেবেছিলাম আমি
হয়তো পারবো তোমার দুচোখে নেমে আসা
বর্ষনকে থামিয়ে বসন্ত নিয়ে আসতে।।

প্রচুর গবেষণা করে আমার
কাছে উত্তর এলো অপ্রত্যাশিত, অযাচিত
কৌতুহল পূর্ন আমার হৃদয় তখন সিক্ত, ক্ষতবিক্ষত কারন...
তোমার চোখের শ্রাবন আসলে বসন্ত কালে নেমে আসা অপ্রত্যাশিত বৃষ্টি ভেজা আকাশ।।

সব লেখা হারিয়ে গেলো
হাতের কলম টা পড়ে গেলো মেঝেতে।।
কলমের কালিতে মেঝেটা লাল হয়ে গেলো
হ্যাঁ, লাল হয়ে গেলো।
কিন্তু সাদা পাতাটা সাদাই রয়ে গেলো।
আঁচড় যে পড়ে নি ঐ সাদা কাগজে...
আচড় যা পড়ার তা তো পড়েছে আমার কলমে
আর তাই আজ মেঝেটা লাল রঙে ভেসেছে

তোমাকে চাই

রূপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক পুরোনো ক্ষতরা উঠলে জেগে
শুধু রোজ মনে পড়িয়ে আমায় দিতো-
এসব প্রেমেই গাছেদের ছায়া লেগে,
নিওন আলোয় এসবকে ছোঁয়নি তো!

অনেক দিনের বাদেও সন্ধ্যে হবে,
জ্বলবে মুখেতে, নিওন আলোর হাসি,
কাগজে হেডিং, কভার বিক্রি তবে,
গড়িয়াহাটায় চৈত্র সেল- আরও বাসী!

নিষ্পাপ মুখে, মিথ্যে কথারা নামে,
দামী জামা পড়ে পকেটমারেরা ঠিকই,
বুকে আজও সেই ছায়ারা অল্প দামে,
অতীতটা- আজও গাছের ছায়ায় লিখি!

যেসব প্রেমেতে গাছেদের ছায়া লেগে,
তারা বুঝে নেবে রবীন্দ্রসংগীত!
মিথ্যে, তোমার বাড়ির নীচেই জেগে,
বুঝতে চাইছে, কতটা লাগছে শীত।

চাদর সরিও, সকাল সাতটা হলে-
পর্দা পেরুলো অতীতের রোদ তাই,
অনেক নিওন, মিথ্যে বন্ধ করে,
গাছেরই ছায়াতে, আমার তোমাকে চাই!

হঠাৎ যদি

মানস মোদক

হঠাৎ যদি ঝগড়া শুরু
পথের ধারে কলরবে
নীরব পথিক দ্রুত হাঁটে
ট্রেনটা যেন ছাড়লো সবে।

যে বেচারা মাঝ পথেতেই
হাত বাড়িয়ে থামাতে যায়
চিৎকারটা বেড়েই চলে
বিষ লেগে যায় তারই গায়ে।

চিন্তার রাশ, রাত বিছানায়
চোখ দুটি যার জেগে থাকে
মাথার উপর দুনিয়া ঘোরে
পিছলে পড়ে একটু বাঁকে।

হঠাৎ আসে শরীরে জ্বর
অনিয়মে কপালে হাত
কেন আসে দুঃখ স্মৃতি
কেইবা দেখায় দাঁত কপাট।

কষ্ট যখন হাসতে শেখায়
দুঃখ কি তার শোভা পায়
হাসি মুখটা অভ্যাসের দাস
সবই নাটক নেই উপায়।

না-বলা ভালোবাসা

অরূপরতন চক্রবর্তী

ভাগের ভালোবাসার ভাগিদারী
বুকে পাথর বেঁধেও ঠোঁটে হাঁসি রাখতে হয় তোমার জন্য।
কষ্টের ফোয়ারায় দশ আঙ্গুল চাপা
তবুও ফাঁকফোকর দিয়ে বেরোয় বালিশ-ভেজা কান্না।

রাতের অন্ধকার আর একাকিত্বের ভয় - মিলেমিশে একাকার।

তবুও দিয়েছি ছেড়ে অধিকার
বারবার চাই শুধু দেখতে
তোমার চোখের বিদ্যুৎ
ঠোঁটের বাঁকানো হাঁসি, এক চিলতে।

প্রেমের জলে

অগ্নিভ নিয়োগী

অজয়ের আজ খুব প্রেম প্রেম পাচ্ছে।
আদিপর্বের বৃষ্টি এসে লাগছে ওর গায়ে,
শিহরিত ধমনী, উপশিরা, স্নায়েন্দ্রিয়
স্বয়ং-সুখেই সুখী হতে চায় অজয়।

প্রেমের গল্পে শুধু ছেলে আর মেয়েই কেন হয়?
বিশালকে তো ওর খুব ভালো লাগে
মহাশূন্যের অন্ধকার ভেদ করে,
রংধনুর আলোয় নিজেকে খুঁজে পেতে চায়।

হাতের ওপর হাত রেখে ময়দানে,
গোলপার্কের মোড়ে দাঁড়িয়ে ফুচকায়,
লেকের ধারের সন্ধ্যে ওদের চেনে
যাদবপুরের ভিড়ে শান্তির খোঁজ পায়।

রোলের ফেলে দেওয়া কাগজে
লেখা আছে ওদের চোখের জল
প্রেমের গল্পে শুধু মেয়ে আর ছেলে
বানের জলে ভেসে চলেছে লক্ষ লক্ষ অজয়-বিশাল।

জীবনের সমস্ত বিপদ থেকে বাঁচতে রোজ ১০ মিনিট খরচ করুন

নির্মাল্য ঘোষ

কখন যে কী ঘটে যায়, তা কেউ বলতে পারে না। বিপদ তো আর বলে আসে না। হঠাত করে আসে আর ছোবল মেরে কোনও কোনও সময় প্রাণটাই নিয়ে চলে যায়। সময় অমূল্য, কেউ শত ধনী হয়েও এক মুহূর্ত সময় কিনতে পারেন না। তেমনই প্রিয়জনের জীবনও অমূল্য। তাই, বিনা কোনও খরচে নিজের ও নিজের প্রিয়জনকে বিপদ থেকে বাঁচাতে হলে পাঁচ মিনিট খরচ করে লেখাটা পড়ুন।

এখানে এমন একটি মহামন্ত্রের সম্পর্কে আলোচনা করতে চলেছি, যা নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে নিয়মিত উচ্চারণ করা শুরু করলে যে কোনও ধরনের বিপদ ঘটার বা দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা কমে বা, সেই বিপদের তীব্রতা অনেকটাই প্রশমিত হয়। এর পাশাপাশি ঈর্ষাকাতর ক্ষতিকারক প্রতিপক্ষদের পক্ষেও আপনার কোনও ক্ষতি করা অসম্ভব হয়ে।

এটা পড়ে কারও মনে যদি প্রশ্ন জাগে মন্ত্র কীভাবে আমাদের সুরক্ষা প্রদান করতে পারে, তাহলে জানিয়ে রাখবো, মন্ত্র হল সেই শক্তি, যা আমাদের চারিপাশে শুভ শক্তির একটি কবজ তৈরি করে দেয় অদৃশ্যভাবে যে কবজ ভেদ করে কোনও ধরনের খারাপ ঘটনা ঘটার আশঙ্কা প্রায় থাকে না।

জেনে নিন সেই সব শক্তিশালী মন্ত্রগুলির একটি যা নানাবিধ বিপদ থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে বা বিপদের তীব্রতা প্রশমিত করতে পারেঃ-

মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র একটি সর্বরোগ সর্ববিপর্যয় সর্ববাধা হরণকারী মন্ত্র। এই মন্ত্র দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করে রচিত। ঋগ্বেদেও এই মন্ত্রটি আছে, আবার এই মন্ত্রটি মার্কণ্ডেয় পুরাণেও পাওয়া যায়। এই মন্ত্রটি নিয়মিত নিষ্ঠাভরে জপ করলে মানুষ সব অশান্তি, রোগব্যাধি, বিপদ থেকে মুক্তি পায়। নিরাকার মহাদেব নিজেই মৃত্যুমুখী প্রাণকে বলপূর্বক জীবদেহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং অপার শান্তিদান করেন। শাস্ত্রমতে এই মন্ত্রটি এতটাই শক্তিশালী যে পাঠ করা মাত্র নানাবিধ বিপদ ঘটার আশঙ্কা কমতে শুরু করে, সেই সঙ্গে খারাপ সময় কেটে যেতেও সময় লাগে না। শুধু তাই নয়, এমনটাও বিশ্বাস করা হয় যে নিয়মিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠ করলে আমাদের শরীর এবং মস্তিষ্কের ক্ষমতা এতটাই বেড়ে যায় যে ছোট-বড় কোনও রোগ-ব্যাধিই শরীরকে ছুঁতে পারে না। ফলে যিনি জপ করছেন, তাঁর আয়ু বাড়ে চোখে পড়ার মতো। তবে এক্ষেত্রে কতগুলি বিষয় মাথায় রাখা একান্ত প্রয়োজন।

তা হল- খারাপ সময়ে এই মন্ত্রটি পাঠ করলে উপকার মিলবেই মিলবে, একা বসে এই মন্ত্রটি পাঠ করতে হবে, মন্ত্রটি যখন পাঠ করবেন তখন যেন খালি পেট থাকে এবং মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র কমপক্ষে ১১বার বা, ১০৮ বার পাঠ করতে হয় একেকবারে। আরও ভালো হয় উত্তর-পূর্ব কোণ অর্থাৎ ঈশাণ কোণের দিকে মুখ করে চান করে পরিষ্কার বস্ত্রে একটি আসনের ওপর বসে পাঠ করলে।

এই মন্ত্রটির সঙ্গে একটি কাহিণী জড়িত আছে। মহর্ষি মৃকন্ডু এবং তাঁর পত্নী মরুদবতী অপুত্রক ছিলেন। তাঁরা তপস্যা করে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন এবং এক পুত্র লাভ করেন, যার নাম মার্কন্ডেয়। কিন্তু মার্কন্ডেয়র বাল্যকালেই মৃত্যুযোগ ছিল। অভিজ্ঞ ঋষিদের পরামর্শে বালক মার্কন্ডেয় শিব লিঙ্গের সামনে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

যথা সময়ে যমরাজ এলেন। কিন্তু মহাদেবের শরণে আসা প্রাণকে কেইবা হরণ করতে পারে? যমরাজ পরাজিত হয়ে ফিরে গেলেন এবং মার্কন্ডেয় মহাদেবের বরে দীর্ঘায়ু লাভ করলেন। পরে তিনি মহাদেবের নির্দেশে মার্কন্ডেয় পুরাণ রচনা করলেন। মার্কন্ডেয় ঋষি মহাদেবের স্তুতি করলেন মহামৃত্যুঞ্জয় স্তোত্রের মাধ্যমে যেটি মার্কন্ডেয় পুরাণে পাওয়া যায়।

মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রটি হলঃ-

ওঁ ত্র্যম্বকম যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম্
উর্বারুকমিব বন্ধনান মৃত্যৌর্মুক্ষীয় মামৃতাত ।।

অর্থঃ- "হে ত্র্যম্বক (শিব), আপনার ভজনা (অর্চনা) করি। আপনি পুষ্টি ও বৃদ্ধি দাতা। পক্ক ফলের মত পতিত হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করুন এবং মৃত্যু হতে অমৃতের পথে চালনা করুন।"

রহস্যময়ী বাংলার বানগড়

ঋতম প্রামাণিক

আমরা সকলেই রহস্যে ভরা ভানগড়, রাজস্থানের কথা শুনেছি। কিন্তু জানেন কি আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও আছে বানগড়।

১৯৯২ সালে পশ্চিম দিনাজপুরকে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ভাগ করা হয়। এই দক্ষিণ দিনাজ-পুরে অবস্থিত ঐতিহাসিক বানগড়।

কলকাতা থেকে ৩৯৭.৮ কিমি দূর গঙ্গারামপুর গিয়েছিলাম একটি বিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে। সেখানে শুনলাম ঐতিহাসিক বানগড়ের কাহিনী। তখনই যেতে ইচ্ছে করলেও বিয়ে বাড়ি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সেদিন গেলাম না।

পরেরদিন সকালেই বেরিয়ে পড়লাম বানগড়ের উদ্দেশ্যে। গঙ্গারামপুর থেকে বানগড়ের দূরত্ব ৩.৩ কিমি। গঙ্গারামপুর ঘড়ি মোড় থেকে শিববাড়ি রোড ধরে টোটো করে যেতে হবে বানগড়।

আসুন বানগড়ের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যাক। কোটিবর্ষ জেলার রাজধানী ছিল বানগড়। উত্তরবঙ্গের নাম পুন্ড্র বর্ধন ভুক্তি ছিল। এদের আবার ভাগ করা হয় জেলায়। কোটিবর্ষ তারই একটি জেলা ছিল। কোটিবর্ষের পুরনো নাম ছিল দেবকট। দেবিকট নামেও এটি পরিচিত।

শুনলাম ৮০ বছর আগে প্রফেসর কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামীর নেতৃত্বে এখানে খনন কার্য চলার সময় প্রচুর প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় এখানে। সেই জিনিসগুলো বিভিন্ন জায়গায় রাখা, তাই কিছু ধ্বংসাবশেষ ছাড়া ওইগুলো দেখা হয়ে ওঠেনি। ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে জানলাম কোথায় কি কি রাখা আছে:

১. বালুরঘাট কলেজের জাদুঘরে রাখা আছে একাদশ শতাব্দীর দয়া নইপালার পাণ্ডুলিপি।

২. বালুরঘাট পুলিশ লাইনে রাখা আছে শতাব্দীর মূর্তি ডারপাল।

৩. গ্রানাইট পাথরের চারটি বড় স্তম্ভ পাওয়া গেছে যেটি বিষ্ণু মন্দিরের স্তম্ভ। এই ৪টি স্তম্ভ রাখা আছে শিববাতি গ্রামে।

৪. প্রচুর মূর্তি, কিছু স্তম্ভ ও বহু ছোট ছোট জিনিস রাখা আছে শিববাতি মিশনারী স্কুলে।

৫. প্রাচীর বিল্ডিং।

বিয়ে বাড়ীতে এসে হঠাৎ করেই এরকম ঐতিহাসিক জায়গার সন্ধান এবং সেখানকার রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার এখনও যেন চোখের সামনে ভাসছে। বাংলার এই জায়গায় না আসলে আপনি জানতেই পারবেন না এখানকার বহু রহস্যময় ইতিহাস। তাই অতীত নিদর্শনের সাক্ষী হতে ও আপনার ভ্রমণ অভিজ্ঞতার ডায়রির পাতাকে সম্পূর্ণরূপদানে আপনাকে আসতেই হবে গঙ্গারামপুরের বানগড়ে।

বেড়াচাঁপা (অক্টোবর ১১, ২০২০)

রবিউল ইসলাম

চোর

প্রচেত গুপ্ত

সিঁদের শেষ ঘা-টা দিতেই আওয়াজ হল ‘ঠং’।

লঙ্কা গেল থমকে। আওয়াজ কীসের! মোহর ভরা ঘড়া? চোখ চকচক করে উঠল লঙ্কার। বাহান্ন বছর পর জীবনটা কি তবে বদলে যাবে? বুক ডিব্‌ডিব্‌ করে উঠল লঙ্কার। সে পিছনে তাকাল। রাত ফুরিয়ে আসছে। শেষরাতের ফিকে আলো গাছের পাতায় পড়ে থাকা জলের মতো টলটল করছে। যে কোনও সময় টুপ্‌ করে পিছলে পড়ে যাবে। দ্রুত হাতে গর্তের মাটি সরাতে লাগল লঙ্কা। কাজ শেষ করতে হবে।

চুরি বিদ্যায় সিঁদ কাটা উঠে গিয়েছে। এখন টেকনোলজির যুগ। লেসার দিয়ে দরজা গ্রিল কেটে ফেল, পাস ওয়ার্ড হ্যাক করে কম্বিনেশন লক খুলে দাও। সবাই এসব শিখে নিয়েছে। লঙ্কাই কেবল তার ঠাকুর্দার আমলের কায়দা মেনে চলে। ক্লাসিকাল ঘরানা। বস্তায় সিঁদ কাঠি নিয়ে বের হয়। মরবার সময় ঠাকুর্দা বলে গিয়েছেন, যে যা বলে বলুক, লঙ্কা মনে রাখবি, চুরি করবি যখন মাথা উঁচু করে চুরি করবি। সিঁদ কেটে গেরস্তের ঘরে ঢোকা হল, রাজার মতো ঢোকা।

গর্ত পরিস্কার। এবার শরীরটা দুমড় মুচড়ে ঢুকিয়ে ফেললেই হবে। ‘টিপ’ তাহলে ঠিক ছিল। চুরি বিদ্যার আসল রহস্যই রয়েছে ‘টিপ্‌’ এ। কার বাড়িতে কী রয়েছে এটাই জানাই হল ‘টিপ’।মোহর ভরা ঘড়া নিয়ে যাওয়ার একটা ঝামেলা হবে। ওটুকু ঝামেলা তো মানতেই হবে। সিঁদ বেয়ে সড়াৎ করে ঢুকে পড়ল লঙ্কা। হাতের ধাক্কায় চাল রাখবার খালি কলসি গড়িয়ে পড়ল। আওয়াজ হল, ঠং।

লঙ্কা মুচকি হেসে, গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। আবার একই ভুল। আবার নিজের ঘরে সিঁদ কেটেছে।

জিজীবিষা...

মধুরিমা রায়

কফি মাগের ধোঁয়া প্রিয় ঋতুর। তাই আজ সকালেও ধোঁয়ার দিকে মন দিয়ে তাকিয়ে ছিল সে।শুধু মেঘ-কুয়াশার ধোঁয়া নাকি মাগের, কোনটা যে ওর বেশী পছন্দের ও এই ৩০ টা বসন্ত পেরিয়ে আজও বোঝে না।সকালে একটা শীত-শীত ভাবে কলকাতায় যে আমেজটা পেত ও, এখানকার ঠান্ডাটা যে তার চেয়ে আলাদা শুধু ঠান্ডা নয় সবকিছুই, সেটা ও বোঝে। তবু মন মানে না...

সকাল থেকে চারিদিকে অন্যরকম পরিবেশ,ছোটবৌদি থেকে ফুলকাকু,বড়জেঠিমা থেকে দাদাভাই সক্কলে বাগবাজারে ঋতুদের বাড়িতে। প্রতিবারই আসে সবাই পিতৃপক্ষের জলদানে তর্পণ করে দেবীপক্ষের শুভসূচনায় মেতে উঠতে। বাগবাজার ঘাটে এতবছর ঋতুও গেছে সবটা চাক্ষুষ করতে, তবে এবার তো সে কলকাতাতেই নেই।

ভিকির ছবিটা একমনে দেখছিল ঋতু। আগের বছরও ওরা একসাথে অনেক লড়াই করেছিল। এ বছর কেই বা আছে ওর পাশে! এই ছবি আর স্মৃতি ছাড়া! ভিকির বাড়িতে সকলে তো নিমরাজিই হয়েছিল,কিন্তু ঋতু পারেনি যৌথ পরিবারের ভাবনা বদলাতে!

ওরা স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটি একসাথে কাটিয়েছে,প্রথম দিকে অসুবিধে হলেও পরের দিকে পাত্তা দিত না লোকের কথায়।অর্থনীতিতে বরাবরই সফল ভিকি, আর ঋতুর বিষয় ছিল বাংলা। ভিকি সব হিসেব মিলিয়ে ব্যালেন্সশীট তৈরীতে পারদর্শী ছিল শুধু জীবনের হিসেবটাই.....
কাগজে যেদিন খবরটা বেরিয়েছিল,ঋতু সারাদিন খাওয়া-দাওয়া না করে শুধু ভিকির ছবির দিকে চেয়ে মনে মনে বলেছিল, "জিজীবিষা মানে জানতে চাইতিস আমার থেকে। বাঁচার এত শখ ছিল তোর, তবু কেন করলি? আর একটা বছর পারলি না লড়াইটা করতে? দেখ আমরা জিতে গেছি।"

ঋতুর বাড়িতে এখন সবাই কথা বলে ঋতুকে নিয়ে। ভুল বুঝতে পেরে কি না, তা ঋতু নিজেও জানে না। ও শুধু জানে আদালত ৩৭৭ ধারাকে বৈধতা দিয়েছে। ঋতু তার ডায়েরি খুলে বসে আবারও সেদিন যেখানে তার পাতার পর পাতা শুধুই তথ্যগুলো জড়ো করে রাখা.....

দ্বাদশ শতকে সঙ্কলিত পদ্মপুরাণ এ পুরুষের নারী হয়ে ওঠার বিকল্প ভাবনা স্থান পেয়েছে। অর্জুন থেকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও স্বেচ্ছায় নারী হয়ে যান এই সংস্কৃতিতে।তামিলনাড়ুর কোভাগাম অঞ্চলে শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী রূপ ধারণ করে বালক ইরাবানকে দাম্পত্যের স্বাদ দেন। আজও তামিলনাড়ুর কোভাগাম অঞ্চলে ইরাবানের পুজো হয়। ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূরণে পার্থসারথি নিজেই নারীরূপ ধারণ করেন,এটাই ভারতীয় ঐতিহ্য। ঋগ্বেদের ঐতিহ্যেও সাযুজ্যপূর্ণ এই ব্যবস্থা।ঋগ্বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা অগ্নির বাবা নেই। দুই মা: পৃথিবী এবং স্বর্গ।ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে ২৮ নম্বর সূক্তের তৃতীয় শোক: "হে জ্ঞানবান অধ্বর্যু! তুমি ঊর্ধ্বমুখ অরণিতে অধোমুখ ধারণ করো; তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী অরণি অভীষ্টবর্ষী অগ্নিকে উৎপন্ন করিল।"

ঋতু জানে আজ ওকে বাড়িতে বারবার মনে করবে কিন্তু একজনও ওকে যোগাযোগ করবেনা। শেষ ডিসেম্বরেই যেদিন ভিকিকে ডেকে ঋতুর মা-বাবা অপমান করেছিল, সেদিন আর বাড়ি ফেরা হয়নি ওর। ঋতুর মোবাইলে ভিকির বাড়ি থেকে বাইক অ্যাকসিডেন্টের খবরটা এসেছিল। মেনে নিতে পারেনি ঋতু...সব ছেড়ে ৩ মাসের মাথায় দার্জিলিং চলে এসেছিল একটা চাকরি জোগাড় করে... তাই আজ সকাল থেকেই ও আনমনা...ঋতু জানে ওর জীবনে আর জিজীবিষা নেই।এই শব্দের অর্থ যখনই ভিকি জানতে চাইত ঋতু ওকে জড়িয়ে ধরে উত্তর দিত,"জিজীবিষা মানে বাঁচার ইচ্ছে।"

এসব ভাবনার মাঝেই ওর ফোনটা বেজে ওঠে ,ও ফোন ধরতেই ওপার থেকে অচেনা কণ্ঠে "ঋতুরাজ কথা বলছ?" হুম বলছি.....
"আমি সংকল্প,তোমাদের ক্লাসমেট ছিলাম ইউনিভার্সিটিতে।"

আমার নম্বর...অবশ্য বদলাইনি....

"ভাগ্যিস নম্বর বদলাওনি তুমি, ৩৭৭ এর পর অনেকবার ফোন করব ভেবেও করা হয়নি,আমি তোমার সবটুকুই জানি। এবার পুজোয় আসবে কলকাতায়?"

আসলে জীবন বাঁচতে শেখায়...লড়াইটা চালিয়ে যেতে হয়।ঋতুরাজ পুজোয় কাশফুল দেখে-ছিল-ঢাকের শব্দও শুনতে পেয়েছিল সংকল্পের সাথে বেরিয়ে,তবে আরোও একটা বছর পর। ৩৭৭ অর্থাৎ সমকাম আইনি স্বীকৃতি পেয়েছিল,তবে ঋতুর বাড়ির লোকজনদের মননে পরিবর্তন এসেছিল আরও কিছুটা পরে।

স্যানিটাইজেসন

দেব কুমার দাস

কালীঘাটে বেরাদা ব্যাঙ্কে টাকা তুলে সদানন্দ রোড ধরে ফিরছি।তাহবে বেলা এগোরাটা। এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় অপরূপ সদানন্দ রোড।কৃষ্ণচূড়ার সিঁদুরে রঙে মাখা রাস্তা।ধোঁয়া ধুলো হর্নের দানবী চেহারার এ রাস্তাকে খোলা চোখে কখনো দেখিনি। আর আজ মনে হচ্ছে গুটি পায়ের এ রাস্তা আমাকে অনেকটা পথ চিনিয়ে দেবে।

আনমনে রাসবিহারী মোড়ের কাছাকাছি এলাম। ডানদিকের চওড়া ফুটপাতে সাবেকি তেতলা পুরানো বাড়ির লাল সিমেন্টের ছোট্ট বারান্দায় গা এলিয়ে এক পাগলাটে লোক। অবিন্যস্ত চুল দাড়ি। তেলচিটে নোংরা ছেড়া ফাটা জামাপ্যান্ট। বা পাশের ছোট পুটলিতে হ্যালান দিয়ে আপন মনে বিড় বিড় করছে। আর চোখে এগিয়ে যেতেই কানে বাজলো এক অচেনা আবদার--

গুড মর্নিং স্যার। লকডাউনের বাজারে কিছু হেল্প করবেন পিজ। থমকে গেলাম। মানিব্যাগ থেকে কুড়ি টাকার একটা নোট হাতে দিলাম।

-থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। থ্যাংকস এ লট।আমায় চিনতে পারলেন না বোধ হয়।

রিতীমতন বিস্ময় নিয়ে তাকালাম। টিকালো নাক চওড়া কপাল নিটোল ছিপছিপে গড়ন। না মাজা হলদেটে দেঁতো হাসিতে বললো-- চিনতে পারলি না তো!

- খুব চেনা চেনা লাগছে।

- মনে পড়ে

পলাশ পাত্র
বেয়াদব ছাত্র
কড়া নজরে রাখেন
সুনীল তলাপাত্র।

- পলাশ তুই, তুই।তুই মানে এখানে এভাবে। সবকিছু আমার গোলতাল পাকিয়ে গেলো। কি বোলব ভেবে পাচ্ছি না। এতো ব্রিলিয়ান্ট এতো মেধাবী আর ও এখানে এইভাবে।

তোর বাড়ি কি আশেপাশেই? কোথ্যেকে ফিরছিস। তা বিয়ে থা করেছিস। কি করিস তুই! একনাগাড়ে অনেকগুলো প্রশ্ন করলো পলাশ।

- আমি এই কাছেই সাহানগর রোডে থাকি।সরকারি চাকরি পাতি কেরানি।বিয়ে কিরে আমার ছেলের বয়স পনেরো।পলাশ তোর মনে আছে অরবিন্দর কথা।জানিস গত বছর জন্ডিসে মারা গেলো।

- অরবিন্দ মানে সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার।

- এক্সাটলি।সত্যি মাইরি তোর সব মনে আছে।

- তুই মনে মনে ভেবে নিলি ও ব্যাটা পাগল সব গুলে মেরে দিয়েছে।তোর থেকে বেশী মনে আছে।বলতো "sensitive souls who visited to the slaughter house, have been converted to vegetarianism , will be well advised to keep clear of Bose Institute"-- বল কার লেখা।

বেশ কিছুক্ষণ ভাবলাম, কিছুটা অপ্রস্তুত।

- কি হলো মিডল ক্লাস লজ্জা বতী লতা।ব্যাটা আমি পাগল।ভুলে গেলি,আরে Aldous Huxley!

- ঠিক ঠিক বোস ইন্সটিটিউট ক্লাস নাইন।

আমাকে পেয়ে পলাশকে কেমন চনমনে লাগছে।ও আবার বলতে লাগলো

-তোর মনে আছে গোপেশ্বরবাবুকে এমন খচিয়ে ছিলাম হেড স্যার কমপেন হলো। আরে ইকনমিক্সের গোপেশ্বরবাবু।ভুলে গেছিস বলেছিলাম স্যার আপনার law of diminishing return and law of diminishing utility i basic illustration পরিস্কার নয়।

-হ্যা হ্যা তারপর তুই একটা দারুন ইলাস্ট্রেশন দিলি। স্যার বললো কাল থেকে তুই আমার চেয়ারে বসবি।

কিছুটা আন্তরিক ভাবেই বললাম - আচ্ছা পলাশ কিছু মনে করিস না তোর মতন ব্রিলিয়ান্ট ছেলেকে এভাবে দেখবো ভাবিনি।তোর এ হাল কেন আমার তো হিসেব মিলছে না।

- হিসেব মিলছে না বলেইতো বেহিসেবি জীবন।কাঁচা বাংলায় পাগল।তোদের র‍্যাসানল ভাবনা অতশত খোঁজে না, insane নাকি erratic না imbalance।সব চটকে মেখেমুখে উপসংহার- শালা পাগলা।

অদ্ভুত সপ্রতিভ হাসি। আগাগোড়া শেষে ভরা।

-সত্যি বলনা কি হয়েছে কি তোর।আমি তো তোর স্কুলের বন্ধু।আমাকে বলতে সংকোচ করছিস!

পথ তুমি চেয়ে থাকো
পথের ই সন্ধানে-
অন্তর তুমি আজও বেঁচে
নিবীড় বন্ধনে,
মুক্ত হৃদয় কথা বলে
নিরব হৃদস্পন্দনে।

-বল কেরানী কার লেখা।

- কে সুকান্ত! না না নজরুল।

পলাশের সেকি উদ্দাম হাসি।ওর মুক্ত হাসি চারিদিক ছড়িয়ে পড়ে।

- আরে ব্যাটা এই পলাশ পাত্রের লেখা। ভুলে গেলি ইলেভেনের স্কুল ম্যাগাজিনে লিখেছিলাম।যা যা বাড়ি যা। বৌ বকবে। আবার যদি শোনে কোনো পাগলের সাথে ছিলি এক বালতি স্যানিটাইজারে স্নান করাবে। লকডাউনের বাজার মাংস ভাত খেয়ে বৌকে জড়িয়ে শুয়ে পরগে যা।

- সত্যি এই লকডাউনের গেঁড়ো আর কতদিন কে জানে।

- তাতে তোমার এতো চুলকানি হচ্ছে কেন কেরানী। ভালোই তো দুধে আমসত্ত্বে ছুটি মারাচ্ছো। মানুষকে মেরে পোয়াবারো যার, সেইতো সরকার।আর তুমি শালা তার দালাল।

- নারে যেভাবে সারা বিশ্বে ছড়াচ্ছে ভয় হচ্ছে।

-কেন ভয়ের কি আছে ! তিন খেপে তোদের যাত্রা দলের হিরো বলে দিয়ে গেলো না থালা বাজাও, শলতে লাগাও আর ঘরে বসে একে অপরের কাঠিবাজি করে যাও। সব ভন্ড নাটুকে। এগুলোর না আছে কালচার না আছে ডেডিকেশন কমিটমেন্ট। সবকটা হিপোক্রেট। তুই কার ওপর আস্থা রাখবি বলতো! আর সবকটার হাবভাব দেখবি, গম্ভীরভাবে সতেরোটা গাড়ির ঘেরাটোপে, তোর ভালোর জন্য ওদের চোখে ঘুম নেই। এগুলোর এতো ছোট কালচার মাকে বিজয়ার প্রণাম করতে গেলে গন্ডাখানেক মেডিয়া ফটোগ্রাফার ডেকে নেয়।পরদিন ফ্রন্ট পেজ কভারেজ। ছিঃ ছিঃ। এই পলিটিক্যাল এনলাইটমেন্ট। এদের জন্য কোটি কোটি গরীব মানুষ চলিশ ডিগ্রী গরমে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে আসছে।আর সব থেকে ঢ্যমনা হচ্ছিস তোরা, এই মিডিল ক্লাস। সেফ ডিসটান্সে থাকো বাবা। সন্ধ্যা হলেই টিভিতে দেখতে বসে যাও ওরা কে কোথায় ক আঁটি বাতেলা মারলো।

সত্যি তা যা বলেছিস।

কেন তোমাদের দিদিমণি।রাস্তায় খড়ি কেটে ও কাকে শেখাচ্ছে।তুই ভাবছিস পাবলিককে।জানবি এরা সব এক একটা উঁচু দরের সেলসম্যান। ও খুব ভালো জানে এটা ইমোশনাল প্রজেকশন।এ খড়ির দাগ রাস্তায় নয় মানুষের মনে কাটবে। তবে হ্যা ওর একাউন্টেবেলিটি কমিটমেন্ট আর পাঁচটার থেকে ঢের ভালো।একটা জিনিস ঠিক ও কিন্তু আদ্যপ্রান্ত বাঙালি।যদিও ভোটের জন্য চানাচুর মারে।কিন্তু ডাইহার্ট বাঙালি।আর যাইহোক মেড ইন বেঙ্গল, চাইনিস চপার নয়।আচ্ছা সহ্য করা যায় বল যে দেশে বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ সুভাষ বোসের মতন মানুষ থাকে সেখানে কি আমার মতন দাড়িওয়ালা লেনিন স্তালিন চেগুয়েভারার দরকার আছে।আর যাত্রাপালার শান্তি গোপালরা তো আরো এককাঠি ওপরে। নেতাজি বিদ্যাসাগরের জন্য চোখের জলে ভাসিয়ে তিন হাজার কোটির মূর্তি হবে ওন্য কারো।পলিটিক্যাল গিমিকে দেশটা হতশ্রী ল্যাঙটো হয়ে গেলো। যখন যে পায় আমাদের আস্ত গান্ডু বানিয়ে চলে যায়।এটা ডেমোক্রেসি নয়।নেতাজী বলেছিলেন না democracy comes after proper education। এ কথার কি ডেপ্ত এই আহ্যামক্রো জানে।এই যাত্রাদলের শান্তিগোপাল রা ইয়ং জেনরেশনের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে যা খুশি কর আমাকে ধরে থাক। আমি থাকলে তুই আছিস। distressed distressed, খুব কষ্ট হয় রে।

অবিচলভাবে ওর কথা গুলো শুনছিলাম।কথায় এতটুকু প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি।তবে কি এমন ঘটলো যে ওর জীবনটা এমন এলোমেলো।

ও আবার বলতে থাকে,- ব্যাপারটা কি জানিস তো, এরা কেউই স্টেটসম্যান নয়।ফলে morality ethics conscience - এসব কি ব্যাটারা বোঝেই না।কোভিড ভাইরাস নিয়েও দেখছিস না পাঞ্জা লড়ে যাচ্ছে কে হিরো হবে।সব কিছু ভোটকেন্দ্রিক।সস্তায় কে হিরো হবো।এদের কাছে ভাইরাস হলো ভোটের মাইলেজ।আলটিমেট টার্গেট--গদি।তা না হলে তোর কেন্দ্রীয় বাহিনী পাড়ার কেষ্টর চায়ের দোকানে উঁকি মেরে দেখছে কে আড্ডা মারছে আর গুজরাটে হু হু করে লোক মরছে! সত্যি কি দেশ মাইরি।

দেখতে দেখতে সাড়ে বারোটা।বললাম তুই খাবি কোথায়।

-আরে লকডাউনে পাগল ছাগলের পোয়াবারো।দেখনা এখনি প্যাকেট খাবার আসবে।তোদের দিদিরা দাদারা নাকে ফট্টি বেঁধে বাহু এলিয়ে এমন ভাবে খাবার দেবে মনে হবে আইপিএলের ট্রফি দিচ্ছে।ব্যাস পরের দিন ফ্রন্ট পেজ।সিলড প্যাক, ডাল ভাত ভাজা আঁচার।বাপের জম্মে কেউ এতো আদর করে খাইয়েছে। যাই বল না কেন মাইরি এই কনুই মারার পলিটিক্স কিন্তু আমাদের মতন বেজাত কুজাতের ইজ্জত বাড়িয়ে দিয়েছে।আর আমাদের তো আর ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই নেই, ওই ভয়টা তোদের মতন ব্যালকনিতে মোমবাতি জালানো পার্টিদের।আমরা এমনিতেই ইমিউনড-স্যাচুরেটেড।সংক্রমন আমাদের ছোঁয় না।তোরা হাজারবার ঘষে ঘষে হাত ধো। স্যানিটাইজার

ক্রীমের মতো করে হাতে মুখে বগলে মেখে নে ।তবুও বন্ধু ওই নোংরা বিষ তোমাকে ছাড়বে না ।ওই বিষ তো তোমাদের ই বানানো ।জালিয়াতি আর দুনম্বরির আস্তানা গায়ে এঁটে এতদিন মচ্ছপ করে গেছো ।গোবেচারা মানুষ ঠকিয়েছো ।ভেবেছিলে কোন শালা কি করবে ।এখন কোথায় পালাবে বাছাধন,কোন স্যানিটাইজার তোমাকে বাঁচাবে! লোক ঠকানো খুন রাহাজানি,পরের বৌয়ের সাথে নোংরামি,বাপ মাকে চাকর বানিয়ে রাখা- আর কি বাকি রেখেছো বাবা সভ্য সমাজ! এখন স্যানিটাইজারের পদাবলি কীর্তন! দাঁড়াও বন্ধুরা এতো সবে শুরু ।আমাদের শালা কিসসু হবে না ।আমরা তো পাগল, দুনম্বরি হিপোক্রেসি নেই ।বুঝিই না ।আমাদের ইকুয়েসন্‌সহজ ।খেতে দিলে খাবো, না দিলে কেড়ে খাবো ।স্যানিটাইজারের প্রয়োজন নেই ।আমাদের কবিগুরু জিন্দাবাদ -

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রানে, এ জীবন পূণ্য করো..... ।

তোদের এঁটো নোংরা খাবারে আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না ।কেনো জানিস,আমাদের ভেতরটা স্যানিটাইজড ।ঝকঝকে ডাইনিং টেবিলে মাজা বাসনে খাবার খেলেও তোরা বাঁচবি না ।দিন তোমাদের ফুরিয়ে এসেছে বন্ধু ।ভেতরটা তোদের সংক্রমনে ছেয়ে গেছে ।স্যানিটাইজারে গা ধূলেও ভেতরের জমা জঞ্জাল যাবে কোথা!

পলাশের হো হো হাসিতেই আমি আবার স্যানিটাইজড নোংরা গলিতে হাড়িয়ে গেলাম ।

কনে দেখা আলো

শাওন বাগচী

মাথার ওপর সাহেব আমলের ভারী পাখাটা প্রবল আওয়াজ তুলে ঘুরে যাচ্ছে । কড়িবরগা থেকে নিচ পর্যন্ত হাওয়া কতোটা গন্তব্য পৌঁছাচ্ছে সেটা নিয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। মনে হয় যেন পাখাটা নিজের হাওয়া নিজেই খাচ্ছে । তবে ঠিক যতোটা হাওয়া দিচ্ছে পাখাটা, ঠিক তার সমপরিমান আওয়াজ অকৃপণভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে সম্পুর্ণ ঘরটায়। কম হাওয়ার কারণে সুরজিতকে তাই বারবার পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছতে হচ্ছে।ওর মন বলছে পাখা চালানোর দায়িত্বে যে ব্যক্তি আছে তাকে গিয়ে একবার বলে " পাখাটা বন্ধ করে দিন এবার, হাওয়া না পাওয়া তবুও সহ্য হয় কিন্তু গরমের সাথে সাথে ফ্রি অফ কস্ট যে শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে তার হাত থেকে নিস্তার পেতে একমাত্র উপায় পাখাটা বন্ধ করে দেওয়া। একেই তো বাইরে ভ্যাপসা গরম তার মধ্যে যদি পাখাটাও এভাবে চলে তাহলে পাখাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভালো বলে মনে হয় ওর।

উঁচু সিলিং-এর এই ঘরটায় রং পড়েনি বহুযুগ, সেটা ঘরটা একঝলক দেখলেই বোঝা যায়। দেওয়ালের জায়গায় জায়গায় রং উঠে অনেককাল আগের একটা বিবর্ণ রঙ বেরিয়ে এসেছে যেটা এই ঘরটার সাথে একরকম মানানসই।একপাশে কাঠের লম্বা একটা বেঞ্চ, সেখানে আপাতত কেউ বসে নেই, কয়েকটা হাতল ভাঙা আর হাতল সমেত কাঠের চেয়ার এবং সাথে কিছু পাস্টিকের চেয়ারও এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে ঘরটার মধ্যে । তার একটাতে সুরজিৎ এখন বসে আছে। সুরজিৎ অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে চারপাশ দেখছে কারণ ও বহুক্ষণ ধরে এই একি জায়গায় বসে আছে। ঘরের মধ্যে একমাত্র নতুনের ছোঁয়া হচ্ছে সামনের দেওয়ালে টাঙানো একটা দেওয়াল ঘড়ি, যাতে এখন সময় দেখাচ্ছে বিকেল চারটে। সামনের মস্ত বড় কাঠের টেবিলটার পিছনে য টাকমাথা এক ভদ্রলোক বসে আছে, অবশ্য সে যে টাক ঢাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে এটা মিথ্যা বলা যাবে না, তা সেই ভদ্রলোক সুরজিতকে মাত্র বারোটা থেকে বসিয়ে রেখেছে " আচ্ছা দেখছি" বলে। অপেক্ষারও একটা বাউন্ডারি লাইন আছে তারপর সেটা অসহ্য হয়ে যায়।

সুরজিৎ ভদ্রলোককে বলল " আমারটা কিছু হলো?"

ভদ্রলোক প্রথমে চশমার উপর দিয়ে সুরজিৎ - কে ভালো করে দেখলেন তারপর খুব সহজ ভঙ্গিতে বললেন " আপনার কোনটা?"

এরা কি করে যে এতো কম স্মৃতিশক্তি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে সেটাই সুরজিৎ বুঝে উঠতে পারে না। সুরজিতের একবার ইচ্ছা হলো উত্তর দেয় আপনাকে বলে কি হবে আপনি তো আবার পাঁচ মিনিট বাদে ভুলে যাবেন। মুখে বলল " ওই যে আমার বোনের ব্যপারটা"। ভদ্রলোক মুখে একটা" অ" আওয়াজ করে নিজের কাজে মন দিলেন। কিন্তু সুরজিতের জেদ ও আজ এর শেষ দেখে ছাড়বে।

দুবছর ধরে সরকারি বেসরকারি মেয়েদের হোম গুলোতে ঘুরতে ঘুরতে আজ ও এখানে এসেছে। কেউ বলে ওখানে যান ওই হোমে আছে। অমুক হোম বলে তমুক হোমে যান, এখানে কেন? কেউ বলে দেখুন পাচার হয়ে গেছে কিনা, হয়তো-বা কারো সাথে ভেগে গেছে। আবার অনেকে বলে " আপনার বোনই-তো না অন্য কেউ", সুরজিতের ভ্রুকুটির দিকে তাকিয়ে বলে " না না কিছু মনে করবেন না, আজকালকার দিনে ভাই বোনের এতো মিল তো দেখা যায় না। তা হারালো কিভাবে? বোন বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছিল বুঝি?

অন্য কারো সাথে ভাব ভালোবাসা ছিল?"

প্রথম প্রথম সুরজিৎ উত্তর দিতো, সবাইকে গুছিয়ে বলতো, স্মৃতির ঝাঁপি খুলে ধরতো সবার সামনে। নিজের ফেলে আসা কষ্টের অতীতটাকে সবার কাছে মেলে ধরে সবার সাথে ভাগ করে নিতে চাইতো। কিভাবে ওদের দুই ভাইবোনের আলাদা হোমে ঠাঁই হলো, ওর বাবা মার কথা, গাড়ি দুর্ঘটনায় তাদের মৃত্যুর কথা। দুটো ছোট ছোট ভাই বোন অসহায়, আত্মীয় স্বজন সেরকম কেউ নেই। তারপর এভাবেই থেমে থাকা মুহূর্তরা জমতে জমতে একসময় পাহাড় হলো । ডিঙ্গাতে না পারা দুর্বোধ্য দেওয়ালগুলি ক্রমশ দূরত্ব কমিয়ে কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো একটু একটু করে। নিকষ কালো অন্ধকার গ্রাস করে নিলো থমকে যাওয়া সময়ের অস্তিত্ব আর শিশু মন। অসহায়তারা বুকে হাঁটু চেপে তখন প্রহর গোনে নিজের মধ্যে। তারপর একসময় সময়ের নিয়মে নিজের অজান্তেই কবে যেন ও বড় হয়ে গেল। হোমের শাসনের গন্ডি থেকে স্বাধীন পায়ে বেরিয়ে এলো। শুরু হলো নতুন জীবন, অথচ অতীত পায়ে পায়ে সবসময় জড়িয়ে আছে। অতীতের গন্ডির মধ্যেই এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে প্রত্যেকটা দিন। সুরজিত হোমের জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার পর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বোনের খোঁজ করা শুরু করল তখন দেখল পৃথিবীর কোন হোমে বোনের হদিস নেই। আজ এখানে এসেছে অনেক আশা নিয়ে লাস্ট তিন বছর আগে নাকি ঝিনুককে এই হোমে পাঠানো হয়েছিল।

সুরজিৎ আবার টাকমাথা লোকটাকে বলল " একটু দেখুন না, কিছু লাগলে আমি দেবো।" শেষের কথাটা বলার সময় গলাটা একটু নামিয়ে নিল সুরজিৎ।

এবার টাকমাথা নড়েচড়ে বসল । " আরে বুঝতেই তো পারেন, দিনের মধ্যে হাজারটা এইরকম কেস আসে। সরকারি ব্যপার , এতো বছরের হাজারটা কাগজ পত্র, একি ছেলেখেলা মশাই যে বোন চাই বললেন আর বোন পেয়ে যাবেন। তবুও আমি দেখেছি কি করা যায় আপনার জন্য। আচ্ছা আমি কিন্তু এডভান্স নিয়ে থাকি।"

সুরজিৎ বলল "কিন্তু আমি তো আগে ফিফটি পরে ফিফটি দিয়ে থাকি ।

টাকমাথা এবার মুম্বাইয়ের ভাইদের মতো বলল" আগে সেভেনটি পরে থার্টি। শেষ কথা। সুরজিৎ টাকমাথার স্টাইলে বলল " ওকে ডান" ।

টাকমাথা অনেকক্ষন হল ওকে আবার আগের জায়গাতে বসিয়ে দিয়ে গেছে। আবার সেই রং চটা দেওয়াল , হাতল ছাড়া এবং হাতল সমেত চেয়ার আর মাথার ওপর বেশী শব্দ করা কম হাওয়া দেওয়া একটা পাখা। এই সবের মধ্যে সুরজিৎ নিজের চিন্তাতেই মগ্ন ছিল আগের মতো। টুকরো স্মৃতি লোফালুফি করতে করতেই খেয়াল হল হঠাৎ - ই এক অপরূপ সুন্দরী তরুণী এবং তরুণী-কে সাথে নিয়ে হোমেরই এক মহিলা কর্মী সুরজিৎ - এর সামনে এসে দাঁড়াল।

মহিলাটি বলল " এই নিন আপনার বোন, মিষ্টি খাওয়াতে হবে কিন্তু।"

সুরজিৎ দেখলো সুন্দরী তরুণীটি ওর দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসছে। তরুণীর পরনে আধ ময়লা সস্তার একটা গাউন , যেগুলোর বাজারি নাম ম্যাক্সি। মাথার বিনুনিটা মাথার পেছন দিক থেকে এসে ঘাড়ের ওপর লেপটে আছে এবং সেটাতে দু দিন আগের বা তারও বেশি আগে শেষ বার চিরুনী পড়েছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু সমস্ত অযত্নই তরুণীর সরলতা কাছে এসে হার মেনেছে এই ব্যপারে নিঃসন্দেহ সুরজিৎ । প্রথমে ও উত্তেজনায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেল বোনকে এতো বছর পর দেখার আনন্দে। মনের তলায় যে একটা কালো মতো মেঘ জমা হয়ে উঠেছিল। কোথা থেকে খানিকটা দমকা হাওয়া এসে কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। গুমোট মনের মধ্যে ভালো লাগার বরফ কুচি ঝড়তে লাগলো।

মেয়েটিই প্রথম কথা বলে উঠল " তুই এসেছিল দাদা, আমি জানতাম তুই আসবি।"

পাশ থেকে মহিলা বলল " মাথায় কিছু নাই পুরা পাগল, দেখবেন না কেমন জ্বালাতন করে আপনাকে। কেউ হোমের সামনে ফেলে দিয়ে গেছিল দেড় বছর আগে। কিছুই বলতে পারেনা, শুধু নিজের নাম বলে ঝিনুক, আর কিছু ছেড়া ছেড়া বাড়ির কথা। বাবা ছোটবেলা মরে গেছিল, মা ওকে খুব ভালোবাসতো , মাও কিছুদিন হলো মারা গেছে। মাঝে মধ্যে চিৎকার করে কাঁদে।"

হোমের মহিলাটি এবার সুরজিতের কাছে জানতে চাইল " আপনি কোথায় ছিলেন এতদিন ? এটা তো মেয়েদের হোম। এসব পাগল ছাগলের জায়গা নাকি এটা? দুদিন বাদেই একে এখান থেকে বিদায় করতো। ভালো হয়েছে আপনি এসেছেন। "

হোমের মহিলা আরো কিসব যেন বলে যাচ্ছেন। সুরজিতের অসহ্য লাগছে, ক্ষণকালের আনন্দে কোথায় যেন একটা হিসাবে গড়মিল হচ্ছে। তখন নিজের ভেতরে হুড়মুরিয়ে পাহাড় ভাঙার শব্দ পাচ্ছে সুরজিৎ। মাত্র তো তেরো চৌদ্দ বছর বোন কে দেখেনি তার মধ্যে এতো কি করে পরিবর্তন

কিভাবে সম্ভব এটা? হ্যাঁ এটা ঠিক তখন ঝিনুক মাত্র আট বছরের ছিল আর ও তেরো। ঝিনুকের জন্মের পর কালো রং দেখে ঠাকুমা বাবাকে বলেছিল " ম্যাইয়্যাটার বিয়া দিবি ক্যামনে, একবার ভ্যাবছোস ?" সেই মেয়ে এত ফর্সা হয় কি করে। সুরজিৎ - এর নিজের অজান্তেই কপালে ভাঁজ পড়েছে অসংখ্য।

মেয়েটা ততক্ষণে ওর পাশে এসে বসেছে। সারা মুখে শিশুর সরলতা। ফিস্ ফিস্ করে বলল "দাদা তোর সাথে অনেক কথা আছে, তোর কানে কানে বলবো শুনতে পাবে না অন্য কেউ। ও মাসি তুমি যাও না দাদার সাথে কথা বলছি দেখতে পাচ্ছনা।"

"ও দাদাকে পেয়ে আনন্দ পেয়ে আনন্দ ধরছে না দেখছি। যাচ্ছি রে যাচ্ছি। " তরুনীর মাসি নামক মহিলাটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলে গেল দাসবাবু আপনাকে অপেক্ষা করতে বলেছে। কি সব সই সাবুদ করার আছে, সেগুলো করে তারপর যাবেন। সুরজিৎ হ্যাঁ না কিছুই বলল না চুপ করে বসে রইল। মেয়েটা অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। সুরজিৎ অর্ধেক কথা শুনছে অর্ধেক শুনছে না কারণ ও ইতিমধ্যে বুঝে গেছে দুজনের নাম এক হলেও এই তরুণী ওর বোন ঝিনুক নয়। দেখেই বোঝা যাচ্ছে উনি উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলা, চেহারায় আভিজাত্য স্পষ্ট। তরুণীটি ততক্ষণে সুরজিৎ - এর আরেকটু কাছে গিয়ে বসেছে, যেমন আপনজনেরা নিজের কাছের লোকের গা ঘেঁষে বসে।

মেয়েটা বার বার বলছে "বিশ্বাস কর দাদা আমি সাইন করতে ভুলে গেছি। তুই আমাকে শিখিয়ে দে।
আমাকে বাড়ি নিয়ে চল দাদা।" কথা যথেষ্ট অসংলগ্ন কিন্তু তার মধ্যে থেকেও কথার ফাঁক ফোঁকোর থেকে বোঝা যায় তরুণীটি এমন কিছু দেখে ফেলেছিল বা জেনে গেছিল যার জন্য ওর চেনা কেউ এখানে ফেলে রেখে যায়। হতে পারে ওর নিজের দাদাই কিন্তু সুরজিৎ - এর এসব কিছুই শুনতে ভালো লাগছিল না। মনটা খারাপ হয়ে গেল আজও পাওয়া গেল না ঝিনুককে । অনেক আশা নিয়ে এসেছিল আজ ও।

"তুই আমাকে আজ নিয়ে যাবি না, নারে? তরুনীর কথায় ওর চিন্তায় ছেদ পড়ল। সারা মুখ জুড়ে শিশুর সরলতা, অভিমানে ঠোঁট দুটো সামান্য ফুলে রয়েছে , বিষাদ মাখা চোখের কোনা দুটোয় জল টল টল করছে। সুরজিৎ যদি বলে না আজ তোকে নিয়ে যাবো না, তাহলেই সেখান দিয়ে জলের ধারা নেমে আসবে।

সুরজিতের একটু মায়া হলো, ওর বোনটাও হয়ত এভাবেই ওর জন্য অপেক্ষা করে আছে। সেই সময় টাকমাথা লোকটা ঘরে ঢুকলো এটা বলতে বলতে " কি হে পেয়েছেন তো বোনকে? আপনার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হল মশাই একটু পুষিয়ে দেবেন। সুরজিৎ চোয়াল শক্ত করে মেরুদন্ড সিঁধে করে সত্যিটা বলেই দিল " না এ আমার বোন নয়। " অনুভবে আবার যেন সেই লোহার শিকলটা শিকড় ছড়িয়ে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রেখে ভারি করে তুলেছে পা দুটোকে। উল্টো পথ পেছনে টানতে থাকে সমানে।

টাকমাথা নিজস্ব স্টাইলে একবার চশমার ফাঁক দিয়ে মনযোগ দিয়ে ওদের দুজনকে দেখল তারপর খুব নির্লিপ্তভাবে বলল " সেভেনটি পার্সেন্টটা কিন্তু আমার চাই। " সুরজিৎ বলল " আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট পাবেন । আমি যা চাইছি, সেটা যদি এনে দেন।"

টাকমাথা হানড্রেড পার্সেন্টের টোপ গিলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

এতক্ষণে সুরজিৎ লক্ষ্য করলো মেয়েটা ওর হাত শক্ত করে ধরে আছে, মুখটা মাটির দিকে নামানো। আরেক হাত দিয়ে নিজের জামার কোনটা আঙ্গুলে জড়াচ্ছে। সুরজিৎ বাধ্য হয়ে বলল ঝিনুক আমি তোমাকে পড়ে একদিন এসে নিয়ে যাবো, আজ তোমাকে দেখতে এসেছিলাম।"

মুহূর্তের নীরবতা নেমে এলো। তারপর মেয়েটা একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল কিছু বায়না করল না, অথচ দাঁড়ানোর ভঙ্গিমায় অভিমান স্পষ্ট। আস্তে করে বলল " আমি জানতাম তুই আমাকে নিতে আসিস নি। আমি পাগল ছাগল। কাল রাখী, তাই এসেছিল, তাই না রে? বলেই আগের বিষাদ ঘনিয়ে আসা সারা মুখে পরমূহুর্তে একরাশ আলোর ছটা।

সুরজিৎ-এর খুব স্পষ্ট মনে আছে এইসব দিনগুলোতে মা বোনকে হাতে ধরে শিখিয়ে দিতো কিভাবে কি করতে হবে। সময়ের প্রলেপে রয়ে গেছে শুধু হাসি গান আর গল্পস্মৃতি। সবকিছু জড়িয়ে রইল মনের কোনে, সময় অসময়ে চোখের জলে। আর রয়ে গেল ওরা দুই ভাইবোন আর সাথে টুকরো টুকরো স্মৃতি দিয়ে তৈরি একটা জলছবি। সবই মনে হয় পূর্বজন্মের ব্যাপার, এতো আনন্দ এতো খুশি ওর জীবনে কি কোনদিন ছিল ?

"দাদা তোর হাতটা এতোটা পুড়ে গেছে, কিছু লাগাসনি কেন ? মা মরে গেছে, আমিও নেই। কে আর তোর দেখাশোনা করবে ?এবার বিষন্নতা জড়িয়ে থাকা মেয়েটার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল বেরিয়ে এলো। সুরজিৎ-এর মনে হল চোখের জল কি সংক্রামক না হলে ওর নি:শ্বাস নিতে এতো কষ্ট হচ্ছে কেন? বুকটা ভারি ভারি কেন লাগছে। কাল ভাতের মার গালতে গিয়ে হাতে পড়ে গেছিল, খানিক ঠান্ডা জল হাতে ঢেলে নিয়েছিল। তারপর তো মনে নেই। আসলে ব্যাথা

পেতে পেতে ইন্দ্রিয় গুলো ভোঁতা হয়ে যায় তখন আর মনের ব্যথা শরীরের ব্যথা কোনটাই ঠিক মানুষকে কাবু করতে পারে না। অনেক ছোটবেলা শরীর খারাপ হলে মার হাতের স্পর্শ হোমের জীবনে সে সব কবেই তো স্বপ্ন হয়ে গেছে মা বাবার সঙ্গে সঙ্গে।

" তুই একটু দাঁড়া আমি ক্রিম নিয়ে আসছি, চলে যাস না যেন।" বলেই ঝিনুক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।"

আর ঠিক সেই মুহূর্তে টাকমাথা লোকটা ঘরে ঢুকছিল। ঝিনুকের সাথে ধাক্কা লাগাতে হাতের কাগজগুলো সব ছড়িয়ে পড়ল। লোকটা দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার করে বলল " অ্যাই, কে আছিস পাগলটাকে বেঁধে রাখ। "সুরজিতের দিকে তাকিয়ে বলল " নাহ আপনারটা হলো না বুঝলেন আপনি বরং যে হোমে বোনকে লাস্ট দেখেছিলেন সেখানে যান।"

সুরজিত টাকমাথাকে বলল." আপনি কি ক্যাশে পুরোটা নেবেন না চেকে?

লোকটা একটা গা জ্বালিয়ে দাওয়া হাসি হেসে বলল " এই সামান্য কটা টাকা আবার চেকে কেন? ক্যাশই দেবেন। তবে দেখুন এসব ব্যপারে আমি কিন্তু এককথার মানুষ। কাজ পুরো হয় নি তাই সেভেনটি পার্সেন্ট।"

" কিন্তু আমি তো পুরোটাই দেবো আপনাকে কারণ ঝিনুকই আমার বোন।"

সুরজিৎ-এর কথার উত্তরে এবার টাকমাথা বলল " সেকি এই যে বললেন ও আপনার বোন নয়। "

মানি ব্যগ খুলতে খুলতে সুরজিত হেসে উত্তর দিল " এরজন্য এক্সট্রা দেবো। তাড়াতাড়ি হিসেব করুণ কতো দিতে হবে। আর ঝিনুককে পাগল বলার জন্য যদি সরি বলেন তাহলে আরো এক্সট্রা পাবেন।"

হোমের বাইরে তখন গড়ানো বিকেলের গায়ে গোলাপি হলদে মেশানো কনে দেখা আলো আলগোছে হেলান দিয়ে আছে। একটু পরেই চলে যাবে অন্য কোথাও। সেই আলোতে বিষন্নতারা ছুটি নেয় এই জীবনের মতো।

মুখপোড়া

শুভম গাঙ্গুলী

বড্ড একা লাগছে দুপুরটা অমর্ত্যর। আজ বিশ্বকর্মা পুজো। বাড়ির ছাদে রোদের মধ্যে একাই দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিক শুনশান। একজন লোকও চলাচল করছেনা রাস্তায়। যা ঝাঁঝাঁ রোদ্দুর, কেই বা বেরোবে? ওপরে একটা চিল অনেক্ষণ ধরে কাইকাই করছে। দিন দিন কলকাতার আকাশে ঘুড়ির সংখ্যা কমছে। অমর্ত্যদের পাড়ায় এখন সে ছাড়া একজনও ঘুড়ি ওড়ায়না। ফাঁকা আকাশে একাই উড়ছে তার চাপরাশ। যেন প্রতিদ্বন্দ্বীহিন, কিন্তু একা। যেমন ও হয়ে গেছে মেঘা চলে যাওয়ার পর। অন্যবার কিন্তু একা যায়না অমর্ত্যর বিশ্বকর্মা পুজোটা। কোনোদিনই তার একা যেত না। এই ফাঁকা ভাবটা এসেছে গত এক বছরে। যবে থেকে বৃষ্টি চলে গেছে।

মেঘা অমর্ত্যর পাড়ারই এক মেয়ে। ছোটবেলা থেকে একই স্কুলে গেছে, এক সঙ্গে পড়াশোনা করেছে। মেঘার বাড়িটা অমর্ত্যদের বাড়ি থেকে চার-পাঁচটা বাড়ি পরেই। দুজনে প্রত্যেকদিন বিকেলবেলা, সব কাজ ছেড়ে এসে দাঁড়াতো বারান্দায়। প্রতিদিনই দেখা হয়, কিন্তু বিকেলের ওই বাক্যালাপহীন কথা যেন সবকিছুর থেকে আলাদা। সবকিছুর থেকে জরুরি। সেই সময়টা যেন দুজনের কোনো কাজ, চিন্তা, ভাবনা নেই। ইঙ্গিত আর ইশারায় বেড়ে উঠেছিল দুজনের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। একই ক্লাসে পড়তো ওরা, আর্টস বিভাগে। সব বিষয়ও এক নিয়েছিল। সারাক্ষন নিজেদের মধ্যে কথা, চুপ করে, যেন কেউ তাতে বাধা না দেয়। মেঘা বেশ বড়লোকের মেয়ে, অমর্ত্যর পরিবার একেবারেই নিম্ন-মধ্যবিত্ত। কিন্তু,অমর্ত্যর কাছ থেকে কোনোদিন মেঘা কিছু চায়নি, অমর্ত্যও না। যতটুকু একে অপরকে দিয়েছে, পূর্ণ ভালোবাসায় আর সম্মানে অপরজন তা গ্রহণ করে সযত্নে রেখে দিয়েছে। অমর্ত্যর দেওয়া একটা বই যেন মেঘার কাছে অমূল্য রতন, মেঘার দেওয়া একটা ফুল যেন অমর্ত্যর কাছে সাত রাজার ধনের থেকেও বেশি। একজায়গায় তা জড়ো করতো ওরা।যাতে কিছু হারিয়ে না যায়। যেন কত অমূল্য সে জিনিস, একটা ফুল বা একটা বই। অমর্ত্য খুব বই পড়তে ভালোবাসে, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের অন্ধভক্ত সে। কত বইই না দিয়েছে মেঘাকে। সব পড়েছে ও। চুপ করে কতক্ষন অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। বিস্ময়ে ভর্তি দুজনের চোখ। কোনোদিন কিছুই সীমা লঙ্ঘন করেনি কিন্তু সীমার মধ্যে যেন বাঁধাই যায়না ওদের। বর্ষার সন্ধেয় টিউশন থেকে ফেরার পথে কতক্ষন কেটেছে ছোট্ট চায়ের দোকানে ফিসফিস করে গল্প করে। মেঘার একটু চুল যখন কানের ওপর এসে পড়তো, অমর্ত্য তা কানের পাশে তুলে দিতো। মাথা নিচু করে হাসতো। খেলাধুলোও ছিল বিস্তর। কোনদিন একা হয়নি ওরা। মেঘা প্রচণ্ড ভালো ঘুড়ি ওড়াতে পারে। ওর প্রিয় ঘুড়ি মুখপোড়া। অমর্ত্যর চাপরাশ। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন যে যার ছাদে উঠে দাঁড়াতো। ওদিক থেকে মেঘার মুখপোড়া ভীষণ বেগে উঠতো, এদিকে অমর্ত্য এক একটা ঘুড়ি মাথায় ঠেকিয়ে “জয় মা” বলে ছেড়ে দিতো। ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুড়ির লড়াই, শর্ত,

যে যার যতগুলো ঘুড়ি কাটবে অপরজন ততদিন তাকে তার টিফিন খাওয়াবে। মেঘা একটার পর একটা অমর্ত্যর ঘুড়ি কেটে কেটে জমাতো আর খিলখিল করে হাসতো। অমর্ত্য ছেড়েই দিত। তার কাছে যেন মেঘার ওই খিলখিলিয়ে হাসিটাই সব। কিচ্ছু চায়না ও। বিশ্বাসযোগ্যতা রাখবে বলে একটি মুখপোড়া হয়তো কাটতো, ব্যাস ঐটুকুই। এই একটা দিন যেদিন রেষারেষি হতো দুজনের মধ্যে। এই জন্যেই হয়তো বলে, প্রেম, ভালোবাসা মানুষকে ভগবানের সব থেকে কাছে পৌঁছে দেয়, সে আত্মত্যাগ করতে শেখে, সে স্বার্থ হারাতে শেখে, সে নিজের থেকেও বেশি অন্য একজনকে ভালোবাসতে শেখে। কি যেন এক অপার্থিব নিরাপত্তা বোধ করত ওরা একে-অপরের সান্নিধ্যে। যেন ও থাকলে কোনো কিছুতে ভয় নেই।

মেঘা আর নেই। একদিন সকালে অমর্ত্য ওর বাড়িতে গিয়ে দেখে তালা দেওয়া। কোনোজয়গাতেই ওকে খুঁজে পেলোনা অমর্ত্য। যেন পঞ্চভূতে লীন হয়ে গেল মেয়েটা! কোনো জায়গাতেই কন্ট্যাক্ট করে পেলোনা ও মেঘাকে। এক সপ্তাহ তারপর ও নিজের ঘর ছেড়ে বেরোতে পারেনি। মেঘার মুখপোড়াটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে দিনের পর দিন। শেষে ডাক্তারের প্রচন্ড বকুনিতে চুপ করেছে, চোখে ইনফেকশন হয়ে যাচ্ছিল। সারাটা বছর শুধু এই ভেবে ভেবে কাটিয়ে দিলো, কোথায় গেল মেঘা? এতটা স্বার্থপর হতে পারলো কিকরে ও? একবারও আমার কথা ভাবলো না? কেন, কোথায় গেল ও? তারপর থেকে একটা ফাঁকা অন্ধকার ওকে গ্রাস করলো। কিছু ভালো লাগেনা। স্কুলে যায় আসে, কাজ রোবটের মতো করেই যায় কিন্তু কোনোকিছুতেই যেন কোনো কিছুরই স্বার্থকতা নেই। একা সে কোনোদিন ছিলোনা, দোকা খুব ভালোই তো ছিল...এরকম কেন হলো তাহলে?

এই যেমন আজ, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন। ভালো লাগছে না অমর্ত্যর। বসে আছে ছাদে। পাশে ফাঁকা একটা জলের বোতল মাত্র। আকাশে একটাই ঘুড়ি উড়ছে, ওর চাপরাশ। কি অলস তার ওড়া। মাঝে মাঝে মাঞ্জা টেনে চাঙ্গা করছে, আবার যে কে সেই। একবার ডুকরে কান্নাও আসছিল অমর্ত্যর, নিজেকে সংযত করেছে। বুঝিয়েছে, যে আমার কথা ভাবেনি, আমি কেন ভাববো তার কথা? আবার মন খারাপ করে বসে থাকে। মা অনেক্ষন আগে খেতে ডেকেছেন। তারপর আর না। বোধহয় টেবিলে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাবার অফিসের আজ হাফ-ডে। কিন্তু এতদুরে অফিস, আসতে আসতে সেই বিকেল হবে।

জলের বোতলটা ভরতে নীচে যাবে বলে অমর্ত্য উঠে দাঁড়ালো যাতে ঘুড়িটা নামিয়ে নেয়। মাঞ্জায় সবেমাত্র টান পড়েছে, হটাৎ তার চোখ গেল মেঘাদের বাড়ির দিকে। দেখতে পেল সেখানে থেকে একটা মুখপোড়া ঘুড়ি উঠছে। অমর্ত্য নিজের চাপরাশকে চাঙ্গা করলো। নিমেষেই সেই মুখপোড়া চাপরাশের একদম কাছে চলে এলো। অমর্ত্যর মন আনন্দে নেচে উঠলো, তাহলে কি মেঘা ফিরে

এসেছে? অমর্ত্যর মুখ থেকে একটা খুশির চিৎকার বেরিয়ে এলো। জোরে যে ডাকল "মে-ঘআআআ"! কেউ সারা দিলোনা। তার মানে কি এটা মেঘার ঘুড়ি না? তারমানে ও আসেনি? কিন্তু মুখপোড়া এখনো সমান বেগে চক্কর কাটছে চাপরাশকে। যুদ্ধের জন্য ডাকছে। অমর্ত্যও সেদিকে মন দিলো। তারপর শুরু হলো ভীষণ লড়াই। এক এক বার চাপরাশ মুখপোড়াকে পাকিয়ে ফেলছে, সে কোনোরকম ভাবে প্রত্যেকবার বেরিয়ে যাচ্ছে। অনেক্ষন এরকম চলার পর ঘুড়িদুটো একে অপরকে পেঁচিয়ে ফেললো আর ওদিকে থেকে হ্যাঁচকা এক টান! পতপত করে উড়তে উড়তে চাপরাশ ভেসে গেল আকাশের ওপারে। মেঘার ছাদের দিকে অমর্ত্য তাকালো। ওইযে, ওইত্ত মেঘা দাঁড়িয়ে আছে! এতদূর থেকেও হাসিটা কি ভীষণ স্পষ্ট। অমর্ত্য বললো, "এসে-ছিস?" মেঘার হাসিটা যেন আরও চওড়া হলো। অমর্ত্যর আনন্দের সীমা রইলো না। সে নেচে বেড়াতে লাগলো ছাদে। তারপরই হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। ভীষণ কান্নায় ভেঙে পড়ল ও! কাঁদতে কাঁদতে শুয়ে পড়েছিল ও।

মেঘা আর নেই। আগেরবছর বিশ্বকর্মা পুজোর পর পরই একদিন টিউশন থেকে ফেরার পথে রাস্তা পেরোনোর সময় একটা বড় গাড়ি মেঘাকে ধাক্কা মারে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তার বলে, "ব্রট ডেড"। তারপর বৃষ্টির বাবা তার মেয়ের শোকাতুর বদ্ধ উন্মাদ মাকে নিয়ে এই বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু মেঘা যায়নি। থেকে গেছে শুধু অমর্ত্যর জন্য। একা কাটতে দেয়নি তাদের প্রিয়তম বিশ্বকর্মা পুজো। এসেছে ও অমর্ত্যর কাছে! তিরিশ বছর কেটে গেছে। অমর্ত্য এখন রাজ্যের আমলা। কলকাতার আর কোনো আকাশ নেই, পুরোটাই ধোঁয়া। কেউই না ঘুড়ি ওড়ায়না। কিন্তু বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটা ছুটি নেয় সাতচলিশ বছর বয়সী অকৃতদার অমর্ত্য। চাপরাশ এখনো ওড়ায়, ওদিক থেকে উঠে আসে একটা মুখপোড়া। মেঘা এখনো সেই সতেরো বছরের কিশোরীই থেকে গেল, অমর্ত্যর মনটাও তাই। বছর বছর প্রমাদ গোনা বিশ্বকর্মা পুজোর।

নীল পাঞ্জাবি কালো ধুতি

সোমা দে

মেজোমামার বিয়েতে তার সাথে প্রথম দেখা। না ঠিক দেখা নয়। আড়চোখে পলক ফেলে ফেলে নীল পাঞ্জাবি কালো ধুতি কে একটু বুঝে নেওয়া। কালো ধুতির চল সে সময় ছিলোনা। তাই সবার চোখই ছিল তার ওপর। নানারকম চাহুনি, যেমন "কি বোকা বোকা" "একি অদ্ভুত" "বাহ বেশ হাটকে তো" ছিল বটে। কিন্তু তাতে তাকে মোটেই অপ্রতিভ মনে হচ্ছিলো না। বরং যেন একটুবেশিই স্বচ্ছন্দ। আর তাতে আড়চোখ আরও বেশি করে তাকেই খুঁজতে লাগলো। তার চোখ দু-একবার আমার চোখকে একনোলেজ করেছিলো বটে তবে খুব দ্রুত। ইতিমধ্যে এই পুরো সাইলেন্ট টেলিফিল্মটা কখন যে আমার ভাই ট্র্যাক করতে শুরু করেছে জানি না। মালাবদলের ভিড়ে আমার কানের কাছে এসে বললো, "লাভ নেই। এনগেজড। আমাদেরই কোচিনের মেয়ের সাথে" . ড্যাম। চুরি করে ধরা পরে যাওয়া তাও আবার সে চোরাই মাল যদি অকেজো হয়।
ফিলিংসটা ঠিক কেমন হয় বলুনতো! যাক চোখাচুখি নিয়ন্ত্রিত হলো তখুনি। সোনু নিগম হয়ে বিড়বিড় করলাম, জানা নাহি থা পিয়ার কি গলি মে।

প্রায় ৭-৮ মাস পরে, অক্সিজেনে তখন দূর্গা পূজার গন্ধ। নতুন জামার মসমস, নতুন জুতোর ফোস্কা, পুরনো বন্ধুর হৈচৈ, পুরনো রেস্টুরেন্টে নতুন মেনু সব চলছিল নিজের তালে।
উলটোদিকের টেবিলে আমাদের মতোই আরেকদল, একইরকম হুলোড়ে মত্ত। শুধু মুখগুলোই অচেনা ..... উহু একটা মুখ তো ভীষণ চেনা। আরিব্বাস। নীল পাঞ্জাবি কালো ধুতি যে। আজ সাদা শার্ট নীল ডেনিম। আর সঙ্গে সঙ্গেই মাথা বলে উঠলো,"না না আর ও পথে না"। ব্যাস সোনু নিগম হয়ে বিড়বিড় করলাম, জানা নাহি থা পিয়ার কি গলি মে। কিন্তু ওপার থেকে ফোর জি নেটওয়ার্কের মতো শক্তিশালী চোখ যেন আমাকে ফলো করছে মনে হলো। ইগনোর করতে, মন দিলাম বিরিয়ানিতে। সবে দু-চামচ মুখে দিয়ে বিরিয়ানিতে মেডিটেশন শুরু করেছি, ওমনি "হাই, ডু উই নো ইচ আদার ..... " সাদা শার্ট নীল ডেনিম আর তার দলবল, চোখের সামনে। কতক্ষন হা করে ছিলাম মনে নেই। বাকি কি বলে গেলো, মনে নেই। আলাপচারিতার শুরু। সুতপা কনুই-এর গুঁতো মেরেবলেছিলো,"এই সেই? খবরদার।
এনগেজেড কিন্তু।"

এরকম সাবধান বাণী শুনে মনে হলো, যেন ও সাবধান না করলে আমি যে কোনো মুহূর্তে সাদা শার্ট নীল ডেনিমকে জড়িয়ে ধরবো। আশ্চর্য্য। তা সেই সাবধানবাণীর ঠেলায় বা বিরিয়ানি কন্সেন্ট্রেশনে বাঁধাপড়ায়, আলাপচারিতাতে কন্সেন্ট্রেট করতে পারিনি। আমি মূলত শ্রোতাই হলাম।

শেষে অবাক করে দিয়ে সুতপা হঠাৎ নবমীতে ম্যাডক্স স্কোয়ারের প্যান বানিয়ে বসলো। সুতপাকে বুঝতে পারে তার সাধ্য কার! আবার দেখা হওয়ার এক্সসাইটমেন্ট যে আমার মধ্যে একেবারেই ছিল না তা বলা ভুল। মাস্কারা লাগালাম একটু ঘন করেই। না না, আর কিছু না। একটা প্রেসে-নট্যাবলে লুক তো দরকার নাকি!।

তবে সুতপা-বুবাই দের সাথে বেরোলে কেন এ কথা মনে হয়না! ওরা ছোট্টবেলার বন্ধু বলে! ম্যাডক্স স্কোয়ারের আড্ডা তখন চরমে, সাদা শার্ট নীল ডেনিম আমার কানে ফিসফিস করে বললো, "হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে। কাল একবার লেকে মিট করা যায়? সেই বিয়ে বাড়ি থেকে ট্রাই করছি। না বললে শুনবো না কিন্তু।" হার্টবিট ১১০। আচ্ছা এমন বুক চিনচিন করে কেন বলুনতো যখন মাথা আর মন ঝগড়া করে? মাথার শত এলার্টকে মিথ্যে করে, দেখি না কি বলতে চায় শুনতে মন চললো দশমীর বিকেলে লেকের ধারে। পৌঁছনোর দু-কিলোমিটার আগেই এসএমএস,"নাহ সামনাসামনি বলার সাহস নেই। অতল, তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে চিনতে পারিনি বলে হৃদি ভেসে গেল অলকানন্দা জলে। ক্যান ইউ হোল্ড মাই হ্যান্ড? ফর লাইফ?" মোবাইল থেকে চোখ তুলে মনে হলো আসেপাশের কিছু লোক হা করে দেখছে আমায়? খেয়াল করলাম আমার মুখটা এক গাল হাসিতে ভরে গেছে কখন আমার অজান্তেই! অক্সিজেনে এখন নীল পাঞ্জাবি কালো ধুতির গন্ধ। আশেপাশে লুকিয়ে আমায় দেখছে না তো? বাড়ি ফিরে ভাইকে একটা কিল মারবো ভাবছি।

গেট টুগেদার

অনুশ্রী ঘোষাল

"এই এই ডাল নয়, সুক্তটা আগে খাও বাবা"

সান্যাল গিন্নির কথায় অপ্রস্তুতে পরে এমি।

সান্যাল বাড়ির ছোট জামাই এমিনেম বাট। বিয়ের প্রায় পাঁচ বছর পর রিয়া আর এমি এসেছে সান্যাল বাড়িতে। বাংলা ভাষাটা রিয়ার সাহচর্যে বোধগম্য হলেও বাঙালি সংস্কৃতি একেবারেই নতুন এমির কাছে।

মহীতোষ সান্যালের তিন পুত্র - পুত্রবধূ, নাতি নাতনী ও তাদের পরিবারের উপস্থিতিতে আজ জমজমাট মহীতোষ -সুধার আদরের 'নষ্টনীড়'। শেষ ১০ দিন ধরে এই মৃতপ্রায় বাড়িটা যেনো প্রাণ ফিরে পেয়েছে। এত বছর পর বাড়ির ছোটরা আবার একসাথে।

"Well spent night with my cousins" -- রিয়ার ফেসবুক পেজে জ্বলজ্বল করছে বেশ কিছু ছবি।

এসবের মাঝে আজ সকাল থেকেই লুচির গন্ধ, ডেকোরেটার্সের আনাগোনা, আত্মীয় পরিজনদের আগমন, ঠাকুর দালানে পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন, ধূপের গন্ধ, সেলফি ফটো -- সবকিছু নিয়ে জমজমাট সান্যাল বাড়ি।

সাহেব জামাই এমির সঙ্গে আলাপ করাতে ব্যস্ত রিয়ার মা অনুরাধা দেবী।অনেক দিন পর মেয়ে জামাইকে কাছে পেয়ে তিনি আজ সব পেয়েছির দেশে।

"সবাই ঠিক করে খাচ্ছেন তো? লজ্জা করবেন না !" -- অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্বে সান্যাল বাবুর দুই পুত্র অনিমেষ আর অখিলেশ।

বাড়িটা প্রায় এক যুগ পর জেগে উঠেছে! এক দৃষ্টে তাকিয়ে দেখেন মহীতোষ বাবু।

রজনীগন্ধার মালা পড়ানো বিশাল বাঁধানো ছবি থেকে বাড়ির বড়কর্তা মিটিমিটি হেসে ভাবছেন "ভাগ্যিস মরলাম⊠ বেঁচে থাকলে তো এভাবে সবাইকে একসাথে দেখতে পেতাম না.."

জীবন দেবতা

সন্টু অধিকারী

আজ ও আকাশ মেঘলা, সাথে ছিপছিপে বৃষ্টি লেগেই আছে তবুও রামের নিস্তার নেই , বাড়ির উঠানে গোয়াল ঘরের সামনে পড়ে থাকা কাঁচি বস্তাটা নিয়ে তাকে মাঠে মেতে হবে ,তা না হলে তার দুই নাম্বার মা অর্থাৎ সৎ মার হাত থেকে তার আর রক্ষে নেই।এই মাঠে যাওয়া ঘাস কাটা এসব অবস্য ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু যখন কচি সবুজ ঘাসের গলায় কাঁচি বাঁধিয়ে টান দেয় তখন মনে মনে ভাবে নিজের কথা,ওর মার কথা যদি তিনি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে ওকে স্নান করিয়ে মাথা আঁচড়িয়ে স্কুলে পাঠাতেন। স্কুলে যাওয়া যেন ওর কাছে একটা স্বপ্নের মতো, একবার সাহস করে বাবাকে বলেছিলো বাবা আমি স্কুলে যাব কিন্ত বাবা ও তার দ্বিতীয় স্ত্রীর ভয়ে কিছু বলতে পারেনি।

বাড়িতে ছোট বড় মিলিয়ে মোট তিন খানা গরু তাদের খাওয়ানো দেখাশোনা করা হল রামের একমাত্র কাজ। সারাদিনের এই খাটুনির পর ওর জোটে এক মুঠো ভাত আর রাতের নষ্ট হওয়া রুটি, এভাবেই চলছে বেশ কয়েক বছর। একদিন বিকেলে রাম একটা গরুকে নি চরাতে গেল মিত্তিরদের পুকুর ধারে,সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে পরছে। গরুটাকে একটা ঘন সবুজ ঘাস ওয়ালা জায়গায় বেঁধে দিয়ে পুকুরের বাঁধানো সিঁড়ির উপর গিয়ে বসল,আর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পুকুরের টলটলে জলের দিকে।

এবার সে ভাবতে লাগলো তার ভবিষ্যৎ এ কি হবে, এই ভাবেই কি তার জীবন চলে যাবে গরু চরাতে চরাতে। তার চাকরি হবে না কারণ সে লেখাপড়া করে না এমনকি কোনো ব্যাবসা ও করতে পারবে না কারণ তার টাকা নেই, এই সাত পাঁচ ভেবে সে ঠিক করলো এবার সে তার জীবন দেবতা কেখুঁজতে বার হবে,করন তার বিশ্বাস তার এই কষ্ট ভগবান লাঘব করবেই তাই সে সব কিছু ছেড়ে পালিয়ে যাবে এক নতুন পরিবেশে যেখানে তার জীবন দেবতা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

আচমকা চমক যাওয়ার তার এই ভাবনার ঘোর কাটল,এরই মধ্যে চারদিকটা আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেছে , আর আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গরুটা ডাকছে বাড়িতে যাবার জন্য।রাম গরুটার কাছে গিয়ে তার দড়ি টা খুলে দিল আর গরুটা লেজ পিঠে তুলে বাড়ির দিকে দৌড় দিল।আর রাম ও হাঁটতে শুরু করল তবে বাড়ির রাস্তায় নয় শহরের দিকের যাবার রাস্তায় , কিছু দূর যেতেই সে মিলিয়ে গেল সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে।

স্পর্শ

সঞ্চারী চক্রবর্তী চ্যাটার্জ্জী

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। শেষ বিকেলের আলো সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। শিরশিরে একটা হাওয়া দিচ্ছে দুপুরের পর থেকে। মাঝে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে কিছুক্ষন আগে। পায়ের তলার মাটিটা বেশ কাদা কাদা। পা ফেললে পা বসে যাচ্ছে।

আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা শহরের গোল্ডসবড়োর উত্তরে একটা পুরোনো কবরখানা। সেখানে চুপচাপ বসে আছে জ্যাক। নিজের গায়ের কালো কোটটা আরেকটু টেনে নিজের শরীরের সাথে জড়িয়ে নিল।

সে এই ক্যারোলিনা শহরেই থাকে। বাবা মা নেই। ছোটবেলা কেটেছে শহরেরই এক অনাথ আশ্রমে। সেখানেই পরিচয় সুইটির সাথে। ওর ছোটবেলার বন্ধু। বন্ধুত্ব কবে যে প্রেমে পরিণত হয়েছিল দুজনের কেউই তা বুঝতে পারেনি। অনাথ আশ্রমের চার্চের গডের সামনে দাঁড়িয়ে একে অপরের হাত ধরে অঙ্গীকার করেছিল সারাজীবন এক সাথে থাকার। এর মধ্যেই জ্যাক চাকরী পেলো শিকাগো শহরে। ছোট্ট অনাথ আশ্রম থেকে বেরিয়ে বড় শহরে গিয়ে যেন জীবনটাকে নতুন ভাবে চিনেছিল জ্যাক। নতুন শহরে , নতুন জীবনের হাতছানিতে বিলাস ব্যাসনের জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছিল জ্যাক। ভুলেই গেছিল ওর জীবনে সুইটি বলে কেউ ছিল। প্রথমদিকে তবু শনি রবিবার করে আশ্রমে ফিরতো, ফোন করতো। পরের দিকে সেগুলো কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছিল। অনেকদিন অপেক্ষা করার পরেও যখন ফিরলোনা জ্যাক তখন একদিন সুইটিই পৌঁছে গেল শিকাগো শহরে। জ্যাকের ভাড়া বাড়ির ঠিকানা ছিলই সুইটির কাছে। সেই ঠিকানা নিয়েই লোককে জিজ্ঞেস করে করে পৌঁছে গেছিল জ্যাকের ঠিকানায়। কিন্তু সেই ফ্ল্যাটে গিয়ে যে এমন ভয়ানক দৃশ্যের সম্মুখীন হবে তা সুইটি ভাবতেও পারেনি। কলিং বেল বাজাতেই একজন অর্ধ নগ্ন বিকিনি পরিহিত সুন্দরী তরুণী দরজা খোলে। সুইটি অবাক হয়ে যায়। জ্যাক তো বলেছিল ও দুইজন ছেলে বন্ধুদের সাথে থাকে। তাহলে এই মেয়েটি কে? বিস্ময়ের আরো বাকি ছিল। ঘরে ঢুকতেই সুইটির পায়ের সামনে একটা মদের বোতল গড়িয়ে আসে। বোতলটা সরিয়ে পাশ ফিরতেই দেখে ডানদিকের একটা ঘর পুরো ধোঁয়ায় ভর্তি। সেই ধোঁয়া দুই হাতে সরিয়ে সরিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে জ্যাক একটি মেয়ের সাথে আপত্তিকর অবস্থায় শুয়ে আছে। তার পাশে আরো দুইটি ছেলে ও মেয়ে শরীরী খেলায় মত্ত। সবার হাতে মদের গাস ও সিগারেট। কেউ স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। সুইটি শুধু একবার চিৎকার করে উঠলো, " জ্যাক" বলে। জ্যাক তখন নেশার ঘোরে। সে একবার "সুইটি" বলে ডেকে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই আবার ধপ করে পরে গেল। সুইটি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর জোরে জোরে হেঁটে যেতে লাগলো বাস

টার্মিনালের দিকে। এই ঘটনার ঠিক দুইদিন পরেই জ্যাক খবর পায় আশ্রমের পাশে বড় যে ইয়েলো পপলার ট্রিটা ছিল, যার তলায় বসে ওরা এক সময় ঘন্টার পর ঘন্টা একে অপরের হাত ধরে গল্প করতো , গান গাইতো আর সেই গাছ থেকে টুপটুপ করে ঝরে পড়তো ফুল ওদের ওপর। সুইটি মনের আনন্দে গাইতো , "ইউ আর দি লাভ অফ মাই লাইফ।"। সেই গাছেরই একটা ডাল থেকে দড়ি ঝুলিয়ে, তার মধ্যে নিজের নরম তুলতুলে গলাটা সমর্পণ করে দিয়েছিল। নিজের পাটা ভাসিয়ে দিয়েছিল হাওয়ায়। সুইটি বলত ও পাখি হয়ে উড়ে যেতে চায়। ওর স্বপ্ন বোধহয় পূরণ হয়েছিল অবশেষে।

ফাদারের থেকে খবরটা পেয়েই ছুটে এসেছিল জ্যাক। ওদের ভালোবাসার, অনেক মান-অভিমানের, খুনসুটির সাক্ষী ছিল এই ইয়েলো পপলার গাছটা, সেই গাছ থেকে যখন সুইটির দেহটা ঝুলে থাকতে দেখলো তখন আর নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি জ্যাক। কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হচ্ছিলো। আজ সুইটির ফিউনারেল ছিল। জ্যাক আজ কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারছেনা। বারবার মনে হচ্ছে সুইটির এই অবস্থার জন্য ওই দায়ী। তাইতো সবার থেকে দূরে এই কবরখানার আরেক প্রান্তে এসে বসেছে ও। কিছুটা সময় একা থাকতে চায়।, কাটাতে চায় নিজের সাথে।

পুরোনো স্মৃতি বারবার উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, দুইহাতে নিজের মুখ ঢেকে কাঁদছিলো জ্যাক। হঠাৎ অনুভব করলো কাঁধে একটা স্পর্শ। কে হতে পারে এই নির্জন কবরখানায়? তবে কি সুইটি ফিরে এল ওর ভালোবাসার ডাকে সাড়া দিয়ে। অনেক আশা নিয়ে মুখ তুলে তাকালো জ্যাক। দেখলো একজন ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন। কালো লম্বা কোট পা অব্দি ঢাকা। মাথায় একটা গোল টুপি। একটা হাত জ্যাকের কাঁধে অপর হাতটা নিষ্ক্রিয় ভাবে ঝুলছে কোটের হাতা থেকে। জ্যাক অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো , " কে আপনি? এই নির্জন কবর খানায় কি করছেন?"

লোকটি মৃদু হেসে উত্তর দিলো, " আমার নাম জর্জ ডিন্স। আমার প্রেমিকা আজ অনেক বছর হলো এখানে শুয়ে আছে। আমারই কর্মফলের জন্য। আমি অনুতপ্ত। তাই প্রত্যেক দিন আসি। ওর কবরে ফুল দিই। ওর আত্মার শান্তি কামনা করি।"

"কি হয়েছিল আপনার প্রেমিকার?" জলভরা চোখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করে জ্যাক।

লোকটি বলতে শুরু করে, " আমি জর্জ ডিন্স। আমি আমরা থেকে আট বছরের ছোট রাচেল ভিনসন নামে একটি সতেরো বছর বয়সী মেয়ের প্রেমে পড়ি। আমাদের দেখা হয়েছিল একজন বন্ধুর বাড়ির ক্রিসমাস পার্টিতে। সেখানে ওর আমাকে প্রথম দেখাতেই মনে হয়েছিল ও ওর স্বপ্নের

মানুষকে খুঁজে পেয়ে গেছে। ও আমায় পাগলের মত ভালোবেসে ফেলে। প্রথম প্রথম আমিও ওর প্রেমে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমার এক অদ্ভুত স্বভাব ছিল। আমি কোনো মেয়েকেই একটানা বেশিদিন ভালোবাসতে পারতাম না। তখন আমি পঁচিশ বছর বয়সী এক ধনী সুপুরুষ । মেয়েরা আমার পেছনে পাগল। আমিও তাদের এই পাগলামি প্রশ্রয় দিতাম। রাচেল এসব জানতে-ানা। সে আমায় ভীষণভাবে বিশ্বাস করতো। কিন্তু একদিন ও জেনে যায় আমার একাধিক মেয়ের সাথে সম্পর্কের কথা। কিন্তু কি অদ্ভুত জানো? এরপরেও ওর আমার প্রতি ভালোবাসা একটুও কমেনি। উল্টে ও বলে ও আমায় অসম্ভব ভালোবাসে এবং আমায় বিয়ের প্রস্তাব দেয়। আমার তখন অনেক কম বয়স, হাতে প্রচুর টাকা, রঙিন জীবন। তখন আমার একটুও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছে ছিলোনা। আমি ওকে বারণ করে দিই, বলি ওর সাথে কেন কারোর সাথেই আমার এখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয় এবং ওর সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিই। মনের দুঃখে রাচেল আস্তে আস্তে গভীর অবসাদে ডুবে যায়। খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ করে দেয় ফলে দিনে দিনে ও দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়তে থাকে এবং অবশেষে একদিন রাচেল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তবে মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ও আমায় ডেকে পাঠায়। আমিও ও অসুস্থ ভেবে ওর সাথে দেখা করতে যাই। ও আমায় নিজের কাছে ডেকে কানে কানে বল," আমি তোমায় খুব ভালোবেসে-ছিলাম জর্জ, তোমায় নিজের করে পেতে চেয়েছিলাম কিন্তু এই জন্মে তো তোমায় আর পাওয়া হলোনা। হয়তো পরের জন্মে তোমাকে নিজের করে পাবো।"

আমি সেদিন চলে আসি ওর বাড়ি থেকে । পরেরদিন খবর পাই ওর মৃত্যু হয়েছে। ওকে এই গ্রেভিইয়ার্ডেই কবরস্থ করা হয়েছিল। এরপর প্রায় এক বছর কেটে গেছে। আমি সম্পূর্ণ ভাবে ওকে নিজের মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। আরো প্রচুর মেয়ের সাথে আমার সম্পর্কচলছিল তখন। একদিন ক্রিসমাস পার্টি থেকে ফেরার পথে আমি পথ ভুলে এই গ্রেভিইয়ার্ডে ঢুকে পড়ি। পার্টিতে নেশা করে আমি পুরোদস্তুর মাতাল হয়ে গেছিলাম। ঠিক করে হাঁটতে অব্দি পারছিলাম না। হঠাৎ খেয়াল হলো আমি কি করে যেন রাচেলের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমি আজও জানিনা ওটা আমার হ্যালুসিনেশন ছিল কিনা। সেদিন আমি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখি। আমি দেখি যে রাচেলের কবর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা কুন্ডলীকৃত কালো ধোঁয়া। অনেকটা কুয়াশায় মত। আস্তে আস্তে সেটা একজন মানবীর আকার নিলো। ভালো করে দেখলে বোঝা যায় যে সেটি রাচে-লরই অবয়ব। আমার নড়াচড়ার শক্তি ছিলোনা। কেউ যেন আমার পা দুটো মাটিতে গেঁথে দিয়েছিল। ঠিক সেইসময় রাচেল নিজের হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা ধরে। আমি অনুভব করি ওর হাতটা ছিল বরফের মত ঠান্ডা। কি অসম্ভব ঠান্ডা তোমায় বলে বোঝাতে পারবোনা। কিন্তু এরপরেই দেখলাম সেই ধোঁয়া অবয়বটি আর নেই। আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম হাইওয়ের ওপরে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখলাম আমি আমার হাতটি নাড়াতে পারছিনা, যে হাতটি রাচেল ছুঁয়েছিল। হাতটিতে অসম্ভব যন্ত্রনা। এর কিছুদিন পর হাতটি অকেজো হয়ে আমার শরীরের থেকে ঝুলতে লাগলো। আমি পঙ্গু হয়ে গেলাম। লোকে আমায় দয়ার চোখে দেখতে শুরু করলো। যে মেয়েরা রাতদিন আমার আশেপাশে ঘুরত তারা আর ফিরেও তাকালনা আমার দিকে। আমি জগৎ সংসারে একজন নিষ্ক্রিয়, অকর্মণ্য মানুষ হয়ে বেঁচে রইলাম। তুমি জানো জ্যাক আমি আজও অবিবাহিত।"

এতক্ষন ধরে লোকটির কথা মনে দিয়ে শুনছিল জ্যাক। এই লোকটির ঘটনাটিও অনেকটা ওরই মত। কিন্তু লোকটা, লোকটা ওর নাম কিভাবে জানলো? ও তো নিজের নাম বলেনি লোকটাকে। কথাটা মনে হতেই লোকটার দিকে তাকালো ও। লোকটা যেন ওর মনের কথা বুঝতে পারলো। কোনো কথা না বলে লোকটা ওর হাত ধরে ওকে নিয়ে গেল একটা কবরের সামনে। বললো , " ওই দেখো আমার কবর। আমি আমার কবরের ওপর রাচেল ও আমার হ্যান্ডশেকের ছবি জীবিত অবস্থাতেই খোদাইকরে রাখার আদেশ দিয়েছিলাম। আর দেখো আমার কবরের পাশেই শুয়ে আছে আমার রাচেল।"

জ্যাক অবাক হয়ে দেখলো লোকটি আস্তে আস্তে ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যেতে লাগল ওর সামনের কবরটির মধ্যে। এই ভয়ানক দৃশ্যের ঘোর কাটতেই জ্যাক দেখলো একটু ঝুঁকে যে কবরের গায়ে একটি সুন্দর অথচ পুরোনো করমর্দনের ছবি। তার নীচে লেখা জর্জ ডিকেন্স। মৃত্যু ১৮৮২। লেখাটা পড়ে থমকে গেলো জ্যাক। ওর পা দুটো যেন মাটির সাথে আটকে রয়েছে। ওর হঠাৎ খুব শীত করতে লাগলো। ঠিক তখনই ও দেখলো পাশের কবরটি অর্থাৎ রাচেলের কবরটির থেকে একটা কালো ধোঁয়া কুন্ডলীকৃত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ও ভয়ে স্থবির হয়ে গেল। লক্ষ্য করলো কবরটির গায়ে নাম লেখা আছে রাচেলে ভিনসন। ধোঁয়াটি আস্তে আস্তে মানুষের অবয়ব ধারন করলো। তারপর হাত বাড়িয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। ভয় পেয়ে এক পা এক পা করে পিছু হাটতে শুরু করলো জ্যাক। রাচেলের মূর্তিটা যখন একেবারে ওর কাছাকাছি চলে এসেছে। ঠিক তখনই ঘটলো ঘটনাটা। ওর সামনে হঠাৎ করেই আরেকটি ছায়া মূর্তির উদয় হলো। রাচেলের ধোঁয়াময় হাতটা জ্যাকের বদলে স্পর্শ করলো জ্যাকের সামনে দাঁড়ানো মুর্তিটার হাত। সঙ্গে সঙ্গে একটা কান ফাটানো আর্ত চিৎকার শোনা গেল। সেই চিৎকার এতটাই তীক্ষ্ণ ছিল যে জ্যাক নিজের কানে হাত দিয়ে চোখ বুজে ফেললো। কিছুক্ষন পরে চোখ খুলে দেখলো ওর সামনে আর রাচেলের ধোঁয়াময় অবয়ব নেই। বরঞ্চ সেই ছায়া মূর্তিটি আস্তে আস্তে ওকে পেছন ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যের গাঢ় অন্ধকারে। জ্যাক ডাকলো, " হে ওয়েট, ওয়েট। কে? কে তুমি?"

ছায়ামূর্তিটি পেছন ফিরে এক করুন হাসি হাসলো। তারপর হাত নেড়ে বিদায় জানালো। জ্যাক অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো, " সুইটি।"

তারপর আর সেই ছায়া মূর্তিটিকে দেখা গেলো না। জ্যাক সেখানেই মাটিতে বসে পড়ে দুইহাতে নিজের মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

মুখোমুখি মনোরঞ্জন

দৃষ্টিভঙ্গির মুখোমুখি মনোরঞ্জন ব্যাপারী

তিনি দলিত লেখক, শুধু তাই নয়, চরম প্রতিকূলতার মধ্যে থেকে উঠে এসে আজ তাঁর লেখা সমাদৃত হচ্ছে বিশ্ব দরবার। বাংলার সেই প্রান্তিক কলমচি মনোরঞ্জন ব্যাপারী। গতবছরই দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্যের সব থেকেও ওজনদার পুরস্কার, ভারতীয় মুদ্রায় ১৮ লক্ষ টাকার ডিএসসি প্রাইজের তালিকার লংলিস্টে জায়গা পেয়েছিল ওনার লেখা উপন্যাস বাতাসে বারুদের গন্ধর ইংরেজি অনুবাদ দেয়ার্স গানপাউডার ইন দি এয়ার।

যাদবপুর স্টেশন চত্বরে একসময় রিক্সা চালাতেন তিনি। অপরাধ জগতেও হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর। শেষে নকশাল আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে যোগদান, জীবন তাঁকে প্রতিনিয়ত যেন পরীক্ষা নিয়ে গিয়েছে। একসময় ঠাঁই হয়েছিল জেলখানায়। আর সেখান থেকেই বদলে গেল তাঁর জীবনের গতিপথ।

মনোরঞ্জন ব্যাপারীর মুখোমুখি হল দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রঃ যার কখনো স্কুলে যাওয়া হয়নি, সংশোধানাগারেও কেটেছে বেশ খানিকটা সময়, তিনি ইতিমধ্যেই লিখে ফেলেছেন ২১ টি বই। তিনি দলিত লেখক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। যখন আমরা ভাবি আর কিছু হওয়ার নেই, তখন তিনি একটি সরকারি চাকরিও পেয়েছেন। এ বিষয়ে কি বলবেন?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: আমাকে নতুন চাকরি দেওয়া হয়নি, আমি ৯৭ সাল থেকেই চাকরি করছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত, মাস এডুকেশন দপ্তরের অন্তর্গত হেলেন কেলার বধির বিদ্যা-লয়ে কুক হিসেবে কাজ করছিলাম। শারীরিক কারনে কারণে, আমার প্রেসার, সুগার আছে, দুই হাঁটু রিপেসমেন্ট হয়েছে, আরো কিছু সমস্যা আছে। আমি সরকারের কাছে আবেদন করেছিলাম কোন হালকা কাজে দিতে। এত কঠিন কাজ আমার করা সম্ভব হচ্ছে না।

মেডিক্যাল বোর্ডও জানিয়েছিল মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে এতো কঠিন কাজ দেওয়া উচিৎ না। শরীরে ক্ষতি হতে পারে। আমি একবার মাথা ঘুরে গরম জলের কড়াইয়ে পড়ে যাই, সারা শরীর পুড়ে যায়। ৯ দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। লেখক হিসেবে আমি কোন সুযোগ সুবিধে চাই নি। ৬-৭ বছর ধরে বহু ছোটাছুটির পরও, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কানে কথাটা পৌঁছনোর মতো কেউ ছিল না। ফাইল পড়ে ছিল, ধুলো জমছিল।

প্রঃ দীর্ঘদিন ধরে আপনি, সরকারি কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন, রান্নার কাজ করতেন, এটাও দেখা গেছে আপনি ১৫০ লোকের রুটি, ২০ কেজি চালের ভাত রান্না করেছেন, একটা সময় রিক্সাও টেনেছেন, আবার সেই হাতেই এতগুলো সৃষ্টি করেছেন। অনুপ্রেরণা কোথা থেকে পান?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: প্রথমত আমার নিজের জীবন থেকে। একটা অসহনীয় জীবন যাপন করেছি। আমাদের অমানবিক সমাজের জন্যে এই জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছি। এভাবে জীবন যাপন করার কথা আমার ছিল না। সমাজের বিধি বিধান আমাকে বাধ্য করেছিল। এই বিধি বিধানের বিরূদ্ধে আমার জিহাদ ছিল।

লেখাপড়া যখন জানতাম না, তখন জিহাদ বা ক্রোধের প্রকাশ ভঙ্গি অন্যরকম ছিল। বোম মেরে দিলাম। যখন লেখালেখির সাথে যুক্ত হলাম, যখন অক্ষর জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারলাম, তখন থেকে লেখালেখির মাধ্যমে এই ব্যবস্থার বিরূদ্ধে আমি বিদ্রোহ এতোকাল করে গেলাম। এটাই আমার লেখার প্রেরণা। এই সমাজকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়তে হবে। মানুষের বসবাসের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সম্মান সমস্ত মানুষ পাবে। এক শ্রেনীর মানুষ পাবে, আর এক শ্রেনীর মানুষ পাবে না, এই বিধি, এই বিধান চলবে না। সেটাই আমার লেখার প্রেরণা।

প্রঃ আপনার ছোটবেলা যেখানে কেটেছে সেই দন্ডকারণ্যের প্রসঙ্গ বা মহাশ্বেতা দেবীর সাথে আপনার আলোচনা, সেসব ইউটিউবে দেখা গেছে। এই মুহূর্তে লেখক হিসেবে আপনার কি মনে হয় সমাজটা ঠিক কতোটা বদলানো দরকার?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: বদলানো পুরোপুরি দরকার। আমূল পরিবর্তন দরকার। সমাজে এমন কোন জায়গা দেখতে পাচ্ছি না, যেই জায়গাটিকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। প্রতিটা জায়গাতেই এমন অবস্থা করে রাখা হয়েছে, যেখানে একদল মানুষ নিস্পেষির হতে থাকবে।

আর যারা নিস্পেষণ করছে, তারা সমাজের সর্বচ্চ শিখরে গিয়ে বসবে, সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। অন্যায় করবে, কিন্তু আইন কানুন তাদের কিছু করতে পারবে না। এর আমূল পরিবর্তন দরকার বলে আমি মনে করি।

প্রঃ মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপে স্বাভাবিক ভাবেই আপনার ভালো লাগছে। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা হলে আপনি কি বলবেন?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: আমার একবার দেখা হয়েছিল দিলি এয়ারপোর্টে। তখন পেনে ওঠার তাড়া ছিল তাই নমস্কার করতে পেরেছিলাম শুধু, কথা হয়নি। দেখা হলে প্রথমে আমি বলব আমি কৃতজ্ঞ দিদি। এটার জন্যে আমি নিজেকে অপরাধী মনে করি যে, আমার খবরটা ওনার কাছে পৌঁছে দিতে পারিনি। পারলে অনেক আগেই সমাধান হয়ে যেত।

এমন কোন বড় সমস্যা ছিল না আমার। উন্নতি চাই নি, অফিসার হতে চাই নি। শুধু রান্নার আগুনের সামনে থেকে সরতে চেয়েছিলাম। উনি বিবেচনা করেছেন, আমার মতো মানুষকে লাইব্রেরীতে দিলে আমার পঠন পাঠন, লেখায় সুবিধা হবে। এজন্যে আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন, দলিতদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণ সম্পর্কে কি মত আপনার?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের যেসব রাজ্যে সরকার আছে, সেখানে দেখা যায় দলিতদের প্রতি, সংখ্যালঘুদের প্রতি, নারীদের প্রতি অত্যাচার অনেক বেড়ে গেছে। পশ্চিমবাংলায় এখনো তা আসেনি। কিন্তু শাসন ক্ষমতা তাদের হাতে এলে অচিরেই তা শুরু হবে। আমাদের চিন্তাশক্তি ভোঁতা হয়ে গেছে। যেই সময় লোকসভায় এই দল এই রাজ্যে ১৮টা আসন পেল, তার আগে ৬টা রাজ্যে হেরেছে। যারাই এর শাসন দেখেছে, তারাই রিজেক্ট করেছে।

কথায় বলে, "যার রাঁধা খাইনি সে বড় রাঁধুনি, যাকে দেখিনি সে বড় সুন্দরি"। পশ্চিমবঙ্গের যে কটা রাজনৈতিক দল তাদের মধ্যে ভালো গুন, খারাপ গুন সবই আছে, ধোয়া তুলসীপাতা কেউই না। তৃণমূলও না। কিন্তু তাদের বাংলা, বাঙালি, পশ্চিমবঙ্গের প্রতি আক্রোশ নেই। অনেক ভালো কাজ করতে চেয়ে অনেক সময় পারেনি। অনেকগুলো ভালো কাজ করেছে। অনেকগুলো পারেনি। সেটা নিয়ে সমালোচনা অবশ্যই প্রাপ্য।

বিজেপি দলটার গোটা ভারতবর্ষের জন্য এমন কোন উলেখযোগ্য পদক্ষেপ নেই। যেটাকে প্রশংসা করা যায়। নোটবন্দীর সময় কতো লোক মরে গেছে। করোনার সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের সাথে কি হয়েছে আমরা জানি। দলিতদের ওপর অত্যাচার, চটি কেন পায়ে দিয়েছে, গাড়ি কেন ছুঁয়েছে, পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। কে কি খাবে সে কারণে মেরে ফেলছে। সেই দলটাকে যারা সমর্থন করছে তারা নিজেদের মৃত্যু গহ্বর নিজেরা খুঁড়ছে।

তৃণমূলের বিরূদ্ধে সমালোচনা করব। কিন্তু আজকে যদি তৃণমূলকে হারিয়ে দিই, তাহলে যারা আসছে তারা যে কি ভয়ঙ্কর, তাদের আর হারাতে পারবে না। মমতা বন্দোপাধ্যায়ে বিরূদ্ধে এখনো পথে নেমে স্লোগান দেওয়া যায়। যাদের আনছ, তারা যদি আসে, তুমি তাদের বিরূদ্ধে একটা কথা বলতে পারবে না। ভারভারা রাও, শুধা ভরদ্বাজকে দেখ। তাদের বিরূদ্ধে একটা কথা বললে তোমাকে জেলখানায় পচিয়ে দেবে। কিন্তু মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বিরূদ্ধে বলে তো মিছিল বের করা যাচ্ছে। মানুষকে ভাবতে হবে।

যতবার সরকার বদলে যাকেই আনা হচ্ছে মানুষ সন্তুষ্ট না। এরপর যাকে আনছ সে যে কতোটা খারাপ তুমি তা বলারই সুযোগ পাবে না। গোবলয়ের কোন রাজনৈতিক দল বাংলাকে ভালোবাসে না। এই দেশভাগের জন্যে কংগ্রেস দায়ী। খুব পরিকল্পিতভাবে দেশভাগ করেছিল এরা।

বাঙালির শক্তি ক্ষয় করার জন্যে। কংগ্রেসও ধোয়া তুলসীপাতা নয়। মানুষকে বুঝতে হবে।

মমতা বন্দোপাধ্যায়কে, তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাচ্ছি না। হারছি আমি নিজে। যাকে জেতাচ্ছি, আর কোনদিন আমাকে জেতা তো দূরের কথা ঐ স্বপ্ন দেখার সুযোগ দেবে না। সচেতন হওয়া দরকার। তা না হলে ভাগ্যে যা আছে হবে, আমরা কি করতে পারি? আমরা তো বহুবছর গলায় রক্ত তুলে চিৎকার করে বুঝিয়েছি তাদের। এখন মানুষ যা চায়, তাই হবে।

প্রঃ সচেতনার অভাব কেন? কেন ভাবতে পারছে না মানুষ?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: যাদের ওপর দায়িত্ব ছিল মানুষকে সচেতন করার, বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী তারা করেনি। ৩৪ বছর এখানে বাম সরকার ছিল। বামপন্থীরা যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক হবে, সমাজ পরিবর্তনের লড়াইটা তারা লড়বে। তারা মানুষের কাছে সেই মতাদর্শটা নিয়েই যেতে পারল না। তারাও আর পাঁচটা রাজনৈতিক দলের মতো ভোটে জেতা, ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছনোর কথাই ভেবে গেছে। যদি তারা মানুষকে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক করত, তাহলে এরকম হত না। যদি তুমি বিপব না কর, প্রতি বিপব হবে। এক জায়গায় সমাজটা তো দাঁড়িয়ে থাকবে না। প্রতি বিপব আসন্ন, সব কিছু দ্রুত বদলে যাবে। আবার সমাজটা কয়েকশো বছর পিছনে পিছিয়ে যাবে।

গরুর দুধে সোনা খোঁজা হচ্ছে, গোমূত্রতে সমস্ত রোগের ওষুধ খোঁজা হচ্ছে। ন্যাশনাল টিভি চ্যানেলে বসে একজন বলছেন, যে নিজের নামের আগে ডক্টরেট লেখেন, বলছেন যে গোবর নাকি কোহীনুরের থেকেও দামি। আমরা শুনছি। ওরা আমাদের নির্বুদ্ধিতার পরীক্ষা নিচ্ছে। যখন দেখছে ওদের কথায় আমরা মাথা ঝাকাচ্ছি, ওরা বুঝে যাচ্ছে এরা নির্বোধ, এদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া সুবিধা।

আমরা যদি প্রশ্ন করতে পারতাম, যারা বলছে, তারা কেন ক্যান্সারে ভুগছে? মানুষের চিন্তা ভাবনার মান উন্নত হয়নি। রাজনীতিবিদ এবং শিল্পী সাহিত্যিকদের মানুষের প্রতি যে দায়বদ্ধতা ছিল, সেটা তারা যথাযথ পালন করেনি। এটা একটা দিক। দ্বিতীয় দিকটি আমি আরো জোড় দিয়ে বলব। একটা শুয়োপোকার ভেতরে এই ইচ্ছেটা থাকে আমি প্রজাপতি হব। প্রকৃতি তাকে সহয়তা করে। একটা ডিমের ভেতরের প্রাণ ভিতর থেকে ঠোকা মেরে বাইরের আবরণটা ভাঙে। প্রথমে তার ইচ্ছেটা থাকে আমি বাইরে বেরোব।

মানুষ যদি নিজের কাজের বিশেষণ করতে পারত, তাহলে আর এই পাগলামিগুলো করত না। কিন্তু সে নিয়ে সে ভাবছে না। যে তারকেশ্বরে বাঁকে করে জল নিয়ে যায়। তাকে যদি জিজ্ঞেস করা যায়, তুমি এই যে জল নিয়ে ২৫ কিলোমিটার এলে তোমার জীবনে কি পরিবর্তন হল? সে নিজেও জানে না। হুজুগ, সবাই যাচ্ছে, সেও যাচ্ছে। ঐ লোকটাই একটা অসুস্থ লোক রাস্তায় পড়ে থাকলে তাকে নিয়ে হাসপাতালে যাবে না।

আমাকে দেখ, আমি কোথায় ছিলাম এখন একটা ভালোবাসা, শ্রদ্ধার জায়গা আদায় করেছি লড়াই করে। তুমি না লড়লে সমাজ তোমাকে কিচ্ছু দেবে না। তুমি নিজের উন্নতির জন্যে চেষ্টা কর, তুমি অবশ্যই হতে পারবে। লড়াইটা তুমি নিজের সাথে নিজে জেত, সমাজ তোমাকে জায়গা দিতে বাধ্য হবে।

প্রঃ জীবন মানে আপনার কাছে কি?

মনোরঞ্জন ব্যাপারী: জীবন মানে আমার কাছে সংগ্রাম, লড়াই। বেঁচে থাকার জন্যে অদম্য জেদ। সৎ পথে থাক, অন্যায় সহ্য করোনা, নিজে অন্যায় করো না। নিজের ওপর অন্যায় হলে আগুন হয়ে জ্বলে ওঠ, অন্যের ওপর হলে সাধ্য মতো পাশে দাঁড়াও। চলতে থাকার নাম জীবন। স্থবির হয়ে যাওয়া, অচল হয়ে যাওয়া, থেমে যাওয়া সেটা মৃত্যু। নিজের মতাদর্শকে আঁকড়ে ধরে বাঁচাই জীবন। মৃত্যু দুরকম। এক শারীরিক মৃত্যু, আর এক নৈতিক মৃত্যু।

আমি কিছু লোককে দেখেছি কিছু বছর আগে তারা একরকম কথা বলত, এখন কিছু সুযোগ সুবিধে, পদ প্রাপ্তির জন্যে উল্টো কথা বলছে। নৈতিক দিক থেকে তারা মারা গেছে। বাঁচতে আমরা পৃথিবীতে কেউ আসিনি। চিড়িয়াখানার কচ্ছপের মতো কেতরে কেতরে সাড়ে তিনশো বছর বাঁচবো? না ভগত সিং-এর মতো ২০-২২ বছর বাঁচবো? সেটা নির্ভর করছে আমাদের ওপর। এটাই জীবন।

পুজোর মিষ্টিমুখ হোক প্যাস্টেল ডি মঞ্জানা দিয়ে

শতাব্দী ভট্টাচার্য

দুর্গা পুজো বাঙালির প্রধান উৎসব। এই পাঁচটা দিনের জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে সকলে। নতুন জামা পরে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরতে যেতে চায় সবাই। আবার সাথে খাওয়া দাওয়া তো লেগেই আছে। কিন্তু এই কোভিড পরিস্থিতিতে পুজোর সময় অনেকেই হয়তো বাইরের কেনা খাবার খেতে চাইবেন না ।

তাই বলে কি বাঙালির পুজোয় পেটপুজো হবে না? এক্কেবারেই না। এবার পুজোর মিষ্টিমুখ হোক বাড়িতে বানানো প্যাস্টেল ডি মঞ্জানা দিয়ে। বাচ্চাদেরও এটা খুবই ভালো লাগযে। রেসিপি রইল আপনাদের জন্য।

প্যাস্টেল ডি মঞ্জানা (আপেল পাই)

উপকরণ:

ময়দা - ২০০ গ্রাম
চিনি - ১৫০ গ্রাম
দারুচিনি গুঁড়ো - ২০ গ্রাম
তেল বা ফ্যাট (মাখন) - ৫০ গ্রাম
ডিম - ১টা
পুদিনা পাতা ভালো করে কুচানো - ৪০০ গ্রাম
আপেল - সিদ্ধ করে নিতে হবে
ক্রিম - পরিমাণ মতো

প্রণালী:

১. সুইস রোল টিন কে ভালো করে মাখন দিয়ে গ্রিস করে নিন। তার উপর গ্রিজ প্রুফ পেপার রাখুন। আবার ভালো করে গ্রিজ করে নিন।

২. বেকিং পাউডার মিশিয়ে ময়দা চালুন । এরপর ফ্যাট মিশিয়ে নিন।

৩. চিনি ভালো করে মিশিয়ে নিন।

৪. দারচিনি গুঁড়ো, কুচনো পুদিনা পাতা, আপেলের টুকরোগুলো, ডিম মেশান ।সব জিনিস গুলি মাখিয়ে নিয়ে একটি গোলাকৃতি তৈরি করুন এবং তার ওপরে ময়দা মাখুন ধীরে ধীরে, বেশি চাপ দেবেন না।

৫. এই মিক্সচারকে গ্রিজড ট্রেতে এমন ভাবে রাখুন যাতে মিক্সচার ও ময়দা টাইট হয়ে থাকে।

৬. ৩৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে ৩০ মিনিট ধরে বেক করবেন। লাইনিং পেপারকে সরিয়ে দিন । নির্দিষ্ট আকারে জিনিসটিকে কাটুন।

৭. ঠান্ডা ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে পরিবেশন করুন।

আর অপেক্ষা না করে বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন প্যাস্টেল ডি মঞ্জানা।

ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন